জীবনী গ্রন্থ ৪

লিংকন

অশ্রুকুমার সিকদার

জীবনী গ্রন্থ ৪

লিংকন

অশ্রুকুমার সিকদার

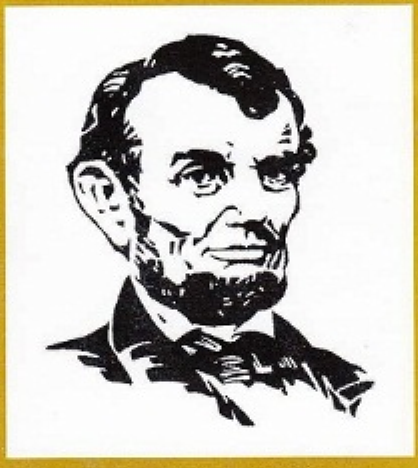

জীবনী গ্রন্থ ৪

লিংকন

অশ্রুকুমার সিকদার

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!
Gooo…

www.shishukishor.org
www.amarboi.com
www.boierhut.com/group
www.banglaepub.com

প্রকাশক: রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
নালন্দা ৬৯, প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ: মানবেন্দ্র সুর
প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৮
মুদ্রণ: অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস: লিন্তা ডিজাইন ভিউ
মূল্য: ৬০.০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ
শ্রীমান অর্চিষ্মানকে
আর শ্রীমতী শ্যামারতিকে

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০০০৪-এর স্বত্বাধিকারী
শ্রদ্ধেয় জনাব অরিজিৎ কুমার এবং লেখক অশ্রুকুমার সিকদার-কে
এই বই বাংলাদেশে প্রকাশের অনুমতি প্রদান করায়
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
বিনীত
প্রকাশক

এক গরিব পরিবারে জন্ম হয়েছিল তাঁর। ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে মার্কিনদেশের কেনটাকি রাজ্যের হজেনভিল গাঁয়ে এক কাঠের তৈরি কুঁড়েঘরে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা টমাস ছিলেন ছুতোরমিস্ত্রি এবং চাষিও; আর কোনো পেশাতেই তিনি সফল ছিলেন না। এই টমাস ১৮০৬ সালে ন্যানসিই হাংকস নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। ন্যানসিই তার মা। টমাসের পূর্বপুরুষেরা ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে বসবাস করতে থাকেন, কিন্তু পরে বাস উঠিয়ে ক্রমাগত মার্কিনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যেতে থাকেন। জঙ্গল পরিস্কার করে হাসিল-করা জমিতে যখন টমাসের বাবা শস্যের বীজ বুনছিলেন, তখন তিনি মার্কিদেশের আদিবাসিন্দা রেড ইনডিয়ানদের হাতে নিহত হন। এই রেড ইনডিয়ানরা ইওরোপ থেকে আসা উপনিবেশ স্থাপনকারীদের শত্রু মনে করত, কারণ আদি বাসিন্দাদের ছলে-বলে-কৌশলে নিজভূমি থেকে উৎখাত করছিল ওই ইউরোপীয়রা।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে টমাসের ছেলে, আমাদের নায়ক, যখন একুশ-বাইশ বছরের যুবক, তখন মামাতো ভাই জন হাংকসকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়াটে কর্মচারী হিসেবে মাল-বওয়া নৌকোয় মালিকের মালপত্র নিয়ে চলেছিলেন নিউ ওরলিয়নসের দিকে। এখানেই ঘৃণ্য ক্রীতদাস-প্রথার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। যে-কেনটাকি রাজ্যে তিনি জন্মেছিলেন সেখানে ক্রীতদাস-প্রথা চালু থাকলেও, খুব ছোটোবেলায় সে-বিষয়ে কোনো ধারণা জন্মায়নি তাঁর। পরে বসসাস করেছেন ইনডিয়ানা ও ইলিয়ন রাজেন্য, যে দুটি ছিল ক্রীতদাসমুক্ত রাজ্য। নিউ ওরলিয়নসেই প্রথম তিনি মার্কিনদেশের সবচেয়ে বড়ো ক্রীতদাস-বাজারের একটিকে সাক্ষাৎভাবে দেখবার সুযোগ পেলেন। তিনি দেখলেন নিগ্রোর রক্ত শরীরে আছে এমন একটি বর্ণসংকর বালিকাকে নিলামে বিক্রি করা হচ্ছে। এই দৃশ্য তাঁকে ভয়ংকরভাবে বিচলিত করে এবং তখনই তিনি শপথ নেন নিষ্ঠুর ক্রীতদাস-প্রথাকে একদিন তিনি আঘাত করবেন, প্রচণ্ডভাবে আঘাত করবেন। সেই শপথ ভোলেননি সেই যুবক। তাঁর আঘাতেই মার্কিনদেশে ক্রীতদাস-প্রথা বন্ধ হয়ে যায়, যখন সেই যুবক বায়ান্ন বছর বয়সে মার্কিনরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সেই যুবকের নাম আব্রাহাম লিংকন। মানুষের স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করে, যারা মনে করে গায়ের রং যা-ই হোক-না কেন সব মানুষই সমান, আব্রাহাম লিংকনকে তারা কোনদিন ভুলতে পারবে না।

আব্রাহামের যখন ন'বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি আব্রাহাম ছাড়াও তার এক দিদিকে রেখে গিয়েছিলেন। ঘরের কাজে অপটু তাঁর বাবা টমাস ১৮১৯ সালের শেষে সারা বুশ বলে এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। সারার নিজেরও আগের বিয়ের তিনটি সন্তান ছিল। সারা এসে লিংকন পরিবারের জীবনযাত্রাকে সুশৃঙ্খল করে তোলেন। হৃদয়বতী এই মহিলা মা-মরা আব্রাহাম ও তাঁর দিদিকে নিজের ছেলেমেয়ের মতো লালন-পালন করতেন। বুদ্ধিদীপ্ত আব্রাহাম বিশেষভাবে তার স্নেহ আকর্ষণ করে, স্নেহের কাঙাল বালক আব্রাহাম ছিল তার খুব অনুগত। বড়ো হয়ে আব্রাহামও কোনোদিন তার প্রতিপালিকা এই মা-কে ভোলেননি। পরবর্তীকালে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তখন তিনি সবার আগে দেখা করতে যান। তার সঙ্গেহ যে-রমণী মা না হয়েও ছিলেন তার আসল মা।

ইনডিয়ানা রাজ্যে যখন তাঁরা বাস করছেন তখনই আব্রাহাম কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পা দেন। খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হন তিনি, উনিশ বছর বয়সেই ছয় ফুট চার ইঞ্চি ছিল তাঁর দৈর্ঘ্য। কিন্তু অপুষ্টির ফলে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মানানসই ওজন হয়নি তাঁর। ইনডিয়ানাতেই তিনি পড়তে-লিখতে শেখেন। গরিব ঘরের এই ছেলেটির স্কুলে পড়বার সুযোগ হয়েছিল এক বছরেরও কম সময়। কিন্তু পড়াশোনোয় ছিল তার খুব আগ্রহ। তার চেয়ে-চিন্তে বই পড়বার, কাঠের কোদালের পিছনে অঙ্ক কষবার, সেই কোদাল চেঁছে আবার অঙ্ক কষবার, অনেক কথা জানা যায়। বাঁচার জন্যে গায়ে-গতরে খাটছিলেন, আর শুধু বই থেকে নয়, জীবনযাপন থেকে নিচ্ছিলেন মূল্যবান শিক্ষা। তিনি কুড়ুল দিয়ে কাঠ কটায়, মাঠের কাজে, উৎপন্ন শস্য কাছাকাছি কলে পৌঁছে দেবার কাজে, শুয়োর মারায়, নৌকা চালানোয় দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। শারীরিক শ্রমের জীবনযাপনই ছিল তার নিয়তি, তিনি যে অন্য কিছু হবেন। সেকথা তার বাবা টমাস লিংকন কল্পনা করতেও পারেননি। কঠোর শারীরিক শ্রমের পরিবেশে মানুষ হয়েও আব্রাহম ছিলেন সরল সহৃদয়ক যুবক-অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন, অন্যের সঙ্গে আলাপে সবসময়েই উৎসুক। ইনডিয়ানায় থাকাকালীন আর্থিক অবস্থার সুরাহা না হওয়ায়, আবার এই পরিবার মুসাফিরের মতো যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির গাঁটরি তুলে উপস্থিত হলো ইলিনয় রাজ্যে। এখানে তারা নতুন করে ঘর বাঁধল। আর এখানেই সেই সাংগামোন নদীর সঙ্গে আব্রাহামের দেখা হলো, যে-

নদীর সঙ্গে তার উত্তরকালীন খ্যাতি আর গৌরব ওতপ্রোতভাবে মিশে যাবে। এই সময়ে লিংকন পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। সামান্য খাবার তাদের জুটত, শীতের দীর্ঘ রাত্রে ঘুমাই ছিল খিদে ভুলে থাকবার উপায়।

মামাতো ভাই জন হাংকস ও আব্রাহাম বছর তিনেক আগে নৌকোয় মাঝিমাল্লার কাজ শিখেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার দৌলতে দুজন চাকরি পেলেন। ওফুট নামে এক বণিকের কাছে; তার মালপত্র নিউ ওরলিয়নসে পৌছে দিতে হবে। সাংগামোর নদী বেয়ে তারা হাজির হলেন নতুন-গড়ে-ওঠা শহর স্প্রিংফিল্ড। এই স্প্রিংফিল্ড শহরের সঙ্গে আব্রাহামের যোগ হবে দীর্ঘস্থায়ী আর নিবিড়; এখান থেকেই শুরু হবে তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথের যাত্রা। যাই হোক, এই শহর থেকে নিজেদের তৈরি এক ভেলাজাতীয় নৌযানে তারা মালপত্র নিয়ে প্রথমে উপস্থিত হন নিউ সালেমে, পরে নিউ ওরলিয়নসে। এই চলার পথের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করবার ব্যাপারে আব্রাহামের কৌশলীবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় মেলে অনেক। আগেই বলেছি, এই চলার পথেই নিউ ওরলিয়নসে ঘৃণ্য ক্রীতদাস-প্রথার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। ওফুট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নিউ সালেমে সে যে-দোকান চালু করতে চলেছে, সেই দোকানের কর্মচারী হিসেবে আব্রাহামকে নিযুক্ত করবে। নিউ সালেমে তখন ছিল গোটা পনেরো কাঠের বাড়ির একটি ছোট্ট গ্রাম। দুজনে এখানে একটি কাঠের আশ্রয় বানালেন, একটি দোকানঘর খুললেন। ব্যবসায়ে আদৌ লাভ হলো না, তবে এই কাজে নিযুক্ত থেকে মানবচরিত্র বিষয়ে আব্রাহামের অনেক অভিজ্ঞতা হলো। এই সময় স্থানীয় মস্তান যুবাদের এক নেতাকে কুস্তিতে হারিয়ে তিনি সাহস আর শারীরিক বলের প্রমাণ দেন। যুদ্ধের সামান্য অভিজ্ঞতাও এই সময় তার হয়। জনৈক রেড ইনডিয়ান নায়ক চুক্তি ভেঙে ইলিনয় রাজ্যের উত্তরাংশ আক্রমণ করলে গভর্নরের ডাকে লিংকনও সেচ্ছা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধে কিছু করতে হয়নি তাঁকে। কিন্তু তাঁর দলের হাতে পড়ে এক বুড়ো রেড ইনডিয়ান অকারণে নির্যাতিত হতে গেলে লিংকন তাকে রক্ষা করেন।

যেমন শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়ে, তেমনি তাঁর বুদ্ধি-মেধা দিয়ে লিংকন মানুষের মনকে জয় করে নিলেন। ইনডিয়ানায় থাকতেই তাঁর বইয়ের জগতের প্রতি একটা টান তৈরি হয়, আর তখন থেকেই তিনি বিশেষ করে। আইন বিষয়ে আকৃষ্ট হতে থাকেন। নিউ সালেমে অবসর সময়ে যেমন তিনি নিজে নিজেই আইন পড়তে শুরু করলেন, তেমনি পড়তে লাগলেন হাতের কাছে যে-বই পান তা-ই। ইনডিয়ানায় থাকাকালীন তিনি পড়েছিলেন বাইবেল তন্ন-তন্ন করে, আর ঈশপের গল্পগুলি, ডানিয়েল ডিফোর রবনিসন ক্রুসোর উপন্যাস, আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদ নাবিকের গল্প, বিনিময়ের রূপকগল্প পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস, উইমসের লেখা জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী। এখন তিনি পড়লেন শক্সপিয়রের নাটক, যা তিনি সারাজীবন ফিরে ফিরে পড়েছেন, আর বার্নসের কাব্য। ভালোভাবে আয়ত্ত করলেন ইংরেজি ব্যাকরণ। এইসব পড়াশুনো, বিশেষ করে

বাইবেল আর শেক্সপিয়রের রচনা তাঁর অসামান্য বক্তৃতাগুলিকে সমৃদ্ধ করেছিল। একজন স্থানীয় শিক্ষক তাঁকে পড়াশুনোয় সাহায্য করতেন। ইতিমধ্যে লোকসানের ফলে ওফুটের দোকান উঠে গেল, আব্রাহাম লিংকন বেকার হয়ে গেলেন। বাঁচার জন্য এবার তিনি শ্রমজীবীর কাজ খুঁজলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর মনে অন্য এক উচ্চাশা জন্মেছে, রাজ্যের আইনসভার সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কী সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। নিজের এলোমেলো পড়াশুনার ফলে সামান্য কিছু রাজনীতি আর ইতিহাস তার জানা ছিল। কিন্তু অর্থনীতি বিষয়ে একেবারেই ছিলেন অজ্ঞ। নিউ ওরলিয়নস ছাড়া অন্য কোন বড়ো শহর দেখেননি, কলকারখানা বিষয়ে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু এই তরুণ প্রার্থী তাতে ঘাবড়ালেন না। পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নির্বাচনে। নিউ সালেমের মানুষ তাকে একজোট হয়ে ভোট দিল। সেখানকার ৩০০ ভোটের মধ্যে ২৭০ ভোটই পেয়েছিলেন আব্রাহাম। কিন্তু অন্য জায়গায় ভোট না পাওয়ায় তিনি হেরে গেলেন।

পরাস্ত মানুষটি ব্যবসায়ে খুঁজলেন জীবিকার্জনের পথ। একজনের সঙ্গে দোকান দিলেন। কিন্তু সেই অংশীদার অচিরেই মরে গেল হাজার ডলারের উপর ঋণ রেখে। সেই ঋণ সততার সঙ্গে পরবর্তী পনেরো বছর ধরে আব্রাহাম তিলেতিলে শোধ করেছিলেন। রাজনীতিতে ব্যর্থ, ব্যাবসায় অসফল, গায়ে-গতরে খাটাই হলো তার বাঁচবার উপায়। কাজ করলেন মাঠে, কাঠ চেরাই করলেন। অনুগত বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য নিউ সালেমের পোস্টমাস্টারের এক চাকরি জোগাড় করে দিল। ইতিমধ্যে দেড় মাসে নিজেনিজেই জরিপের কাজ শিখে নিয়ে নিযুক্ত হলেন সহকারী জরিপকারের পদে। পড়াশুনোয় কিন্তু বিরতি নেই; তাঁর পড়া হয়ে গেছে গিবনের লেখা রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের ইতিহাস, রলিনসের প্রাচীন ইতিহাস। আর তিনি পড়ে চলেছেন আইনের যাবতীয় বই। ছোটোখাটো স্থানীয় মামলায় তিনি ওকালতির সুযোগ পাচ্ছিলেন। এমন সময় আবার এল নির্বাচনের সুযোগ। এবার তিনি জয়ী হলেন, ১৮৩৪ সালে ইলিনয় রাজ্যের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি। টাকা-পয়সার টানাটানি সত্ত্বেও লিঙ্কনের নিউ সালেমের দিনগুলি ছিল যৌবনের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা। অন্যদিকে নিজের চেহারা, নিজের আনাড়িপনা বিষয়ে, গরিবি বিষয়ে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলে সহজভাবে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি অ্যান রোটলেজ বলে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলেন। মেয়েটির সম্বন্ধে আমরা বেশি কিছু জানি না, শুধু জানি পরিচয়ের অল্প দিনের মধ্যেই অ্যানের অকালমৃত্যু হয়। মেরি ওয়েনস বলে আর-একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও ভেঙে যায়। এই সময়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজের সুবিধা হবে বলে নিউ সালেম থেকে নিজের বসবাস উঠিয়ে আব্রাহাম লিংকন ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী স্প্রিংফিল্ড শহরে বসবাস আরম্ভ করেন।

১৮৩৭ সালের ১৫ এপ্রিল তারিখ আব্রাহাম লিংকন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য স্প্রিংফিল্ডে এলেন। তখন তাঁর বয়স আঠাশ বছর। আর এরও ঠিক আঠাশ বছর পরের এক ১৫ এপ্রিল তারিখে তাঁর মৃত্যু হবে। এই শহরে থেকেই তাঁর উত্থানের সূত্রপাত, এই শহরেই তিনি সমাহিত হয়েছিলেন। যদিও রাস্তাঘাট পাকা ছিল না, রাস্তায় ছিল না আলো, তবু ইলিনয় রাজ্যের এই রাজধানী তখনই স্থানীয় সম্ভ্রান্তদের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। একজন উচ্চাশী মানুষের পক্ষে স্প্রিংফিল্ড ছিল উপযুক্ত জায়গা। একথা মনে করলে ভুল হবে যে আব্রাহাম উচ্চাশী ছিলেন না। তিনি খানিকটা আলসে ছিলেন, ছিলেন অতি-সাবধানী, মনের জোরের খানিকটা অভাব ছিল তাঁর, কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল না। তবে তিনি মানুষের ক্ষতি না করে, নিঃস্বার্থভাবে নিজে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চেয়েছেন। আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কোনো বড়ো লক্ষ্য অর্জন করতে পারি না। কিন্তু উচ্চাশার লক্ষ্য ভালো হতে হবে, পথ খাঁটি হতে হবে। স্প্রিংফিল্ডে যখন এলেন তখন তিনি আইনসভার সদস্য হিসেবে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁর পকেট তো ফাঁকা। চার বছর এক বন্ধুর বাড়ি খেতেন, থাকতেন একটি ঘরে অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে। সেই দ্বিতীয় বন্ধুটি প্রথম দিন তাকে দেখে বলেছিলেন, ‘এমন বিষণ্ন ম্লান মুখ আমি জীবনে দেখিনি।’ পাঁচ বছর পরে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসা এক বড়োঘরের মেয়ে মেরি টডের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের বিয়ে খুব যে সুখের ছিল না নয়, আবার খুব অসুখেরও ছিল না। বিয়ের সূত্রে একটি নামকরা পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা আব্রাহামের রাজনৈতিক উচ্চাশাপূরণে সহায়ক হয়েছিল। মেরি টড অসম্ভব একগুঁয়ে ছিলেন; দামি পোশাকপত্র কেনবার ব্যাপারে একেবারে বেহিসেবে। যতই লিংকন উঁচুপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ততই তাঁর স্ত্রীর চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু স্ত্রী অস্থিরমতি হলেও লিংকন ধৈর্য হারাননি। এই দুর্ভাগিনী শেষজীবনে উন্মাদিনী হয়ে যান, লিঙ্কনের মৃত্যুর কয়েকবছর পরে তাঁকে পাগলাগারদে দিতে হয়।

যখন বিয়ে হয় তখন আব্রাহামের বয়স তেত্রিশ বছর। ইতিমধ্যে তিনি চারবার ইলিনয় আইনসভার সদস্য হয়েছেন। এবার তার লক্ষ্য হলো মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হওয়া। আমরা যাকে পার্লামেন্ট বলি আমেরিকায় তাকেই বলে কংগ্রেস। দু-দুবার তিনি নিজের রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হতে চেয়ে ব্যর্থ হলেন। ব্যর্থ মানুষ অনেক সময় কবিতা লেখে, লিংকনও এই সময় লিখেছিলেন কিছু হতাশার

কবিতা। বিয়ের পরে-পরে তিনি হার্নডন বলে এক তরুণ বন্ধুকে নিজের আইনব্যাবসার অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আব্রাহামের নির্বাচনের ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছিল এই বন্ধু। লিংকন ছিলেন ধরিস্থির, সাবধানী, আর হার্নডন ছিলেন যেমন আদর্শবাদী, তেমনি লড়াকু। হার্নডন দাসপ্রথার বিরোধী ছিলেন। লিঙ্কনের প্রতি তাঁর অনুরাগ আর আনুগত্যের কোনো শেষ ছিল না, বইপত্রে যা তিনি পড়তেন সব বিষয়ে লিংকনকে ওয়াকিবহাল রাখতেন। ১৮৪৬ সালে আব্রাহম অবশেষে দলের হয়ে প্রার্থীর মনোনয়ন পেলেন এবং বিরাট ভোটের ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থীকে হারিয়ে দিলেন। নির্বাচনে নিতে তিনি মার্কিন কংগ্রেসে ইলিনয় রাজ্যের প্রতিনিধি হলেন। এখন তাঁর চিন্তা-চেষ্টা আর একটি রাজ্যের ছোটো সীমানায় সীমাবদ্ধ রইল না। মার্কিনদেশের নামজাদা মানুষদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো, বড়ো বড়ো শহর তিনি দেখলেন, জাতীয় দৃষ্টি দিয়ে সব বিবেচনা করতে জানলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কনের পরবর্তী জীবনকথা জানতে গেলে এখন তোমাদের মার্কিনদেশের ইতিহাসের কিছু কথা না জেনে নিলে চলবে না। কলম্বাসের তথাকথিত আমেরিকা আবিষ্কারের পর একশো বছর পার হয়ে গেলেও এই নতুন দুনিয়া ইংল্যান্ডবাসীর সামনে যে-সুযোগ এনে দিয়েছিল সে-বিষয়ে তারা সচেতন হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আমেরিকায় ইংরেজবসতি ভালোভাবে শুরু হয়। ইংল্যান্ডের গরিবেরা ও ভাগ্যান্বেষীরা এই নতুন দুনিয়ায় দলে-দলে আসতে থাকে। পরে শুধু ইংল্যান্ড থেকে কেন, ইউরোপের অন্যসব দেশ থেকেও। তবে বসতিস্থাপনে ইংরেজদের সাফল্যই সবচেয়ে বেশি। ইউরোপ থেকে আসা মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি জনই ছিল ইংরেজ। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে-বারোটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার সংস্কৃতি ছিল মোটের উপর ইংরেজসংস্কৃতি। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে যারা একদা ছিল ইংরেজ, তাদের বংশধরেরা ধীরে ধীরে এই নতুন দেশে হয়ে যাচ্ছিল আমেরিকান। ইংল্যান্ডের শাসকেরা এই নতুন ভূখণ্ডের উপর তার রাজনৈতিক শাসন জোরালো করতে চাইলে, নতুন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মার্কিনদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত দিলে, ১৭৭৬ সালে চৌঠা জুলাই তেরোটি উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এইসব উপনিবেশ বা রাজ্যগুলি একত্রিত হয়ে নাম নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এই যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে বসতিস্থাপন করেছিল যারা, তাদের মধ্যে ছিল অনেক কারিগর। এই অঞ্চল হয়ে উঠেছিল ব্যাবসা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র। সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া গড়ে উঠল অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে। অন্যদিকে ভার্জিনিয়া থেকে টেকসাস রাজ্য পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চল হলো প্রধানত কৃষিপ্রধান। সেখানে চাষ হতো তুলো, আখ, নীল আর তামাক। এই চাষের কাজে খামারগুলোয় শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হতো আফ্রিকা থেকে আনা কালো চামড়ার ক্রীতদাসদের। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে বিরোধ তো ছিলই, তার সঙ্গে মিলে গোল ক্রীতদাসপ্রথা নিয়ে বিরোধ। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংরেজ ওলন্দাজ পর্তুগিজ বণিকেরা আফ্রিকা থেকে এক কোটি ক্রীতদাস আমদানি করে, মানুষবিক্রির ঘৃণ্য ব্যাবসা করে প্রচুল লাভ করে। ইংরেজ বণিকেরা পশ্চিম আফ্রিকায় শাস্তা কাপড়, বন্দুক, বারুদ রপ্তানি করত, বিনিময়ে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ

এনে বিক্রি করত মার্কিন উপনিবেশে ও অন্য জায়গায়। এই ক্রীতদাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না, তারা ছিল ভারবাহী পশুর সমান। মালিকের অত্যাচার থেকে নিস্তার পাবার জন্য তারা পালিয়ে গেলে কুকুর লেলিয়ে তাদের ধরা হতো, হত্যা করা হতো। লংফেলোর কবিতা "হানটেড নিগ্রো" পড়লে সেই মর্মন্তুদ অবস্থা বুঝতে পারবে তোমরা।

এই প্রথার অন্যায় সম্বন্ধে মার্কিনদেশে ধীরে-ধীরে প্রশ্ন উঠতে থাকে। ১৭৭৪ সালে মার্কিন উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে একমত হয়ে স্থির করেন। ক্রীতদাস-প্রথা দূর করাই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য, আপাতত আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানি বন্ধ করা হবে। ক্রমেই বেশিসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ মার্কিনি অনুভব করতে থাকেন ক্রীতদাস-প্রথা তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শের পরিপন্থী। বিশেষত মার্কিন দেশের উত্তরাঞ্চলে এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তীব্র হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা— ওয়াশিংটন, জন অ্যাডামস, জেফারসন, ম্যাডিসন— সবাই ছিলেন এই প্রথার বিরোধী ! যদিও উত্তরাংশের রাজ্যগুলি ছিল ক্রীতদাস-প্রথামুক্ত, কিন্তু দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এই প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল। বিশেষত তুলো চাষের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো কালো মানুষ ক্রীতদাসদের। তাদের কঠোর ঘাম-ঝরা পরিশ্রম হয়ে ওঠে। দক্ষিণের শাদা-চামড়া খামার-মালিকদের ধনদৌলতের ভিত্তি। যে-প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তাদের ঐশ্বর্যের বুনিয়াদ, সেই প্রথম উৎখাত হোক স্বভাবতই-সেটা চাইত না সেইসব মালিকেরা।

গোড়ায় আমরা দেখেছিমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তেরোটি রাজ্য নিয়ে। আমাদের ভারতবর্ষে যেমন-- বিহার, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গের মতো অঙ্গরাজ্য আছে, তেমন। তবে দেশরক্ষা, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আর শুল্ক আদায় ছাড়া অন্য ব্যাপারে মার্কিন রাজ্যগুলি ছিল আমাদের রাজ্যগুলির চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন। যাই হোক, পরবর্তীকালে একের পর এক অনেকগুলি রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয়। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে লুসিয়ানা রাজ্য কেনা হয়। ফরাসি সাম্রাটের কাছ থেকে এবং স্পেনের কাছ থেকে ফ্লোরিডা রাজ্য কেনা হয়। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক যোগ দেয় মিসিসিপি, আলাবামা ও আরকানসাস রাজ্য। ১৮৪৫ সালের মেকসিকো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টেকসাস রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হলো, দুবছর পরে ক্যালিফোর্নিয়া। ইউরোপ থেকে ভাগ্যন্বেষী মানুষ দলে-দলে আসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা লাফিয়ে—লাফিয়ে বেড়ে চলল এবং উপনিবেশ বিস্তার হতে লাগল। ক্রমাগত পশ্চিম থেকে আরও পশ্চিমে। এইভাবে জনসংখ্যা বাড়বার সঙ্গেসঙ্গে বেড়ে চলল মার্কিনদেশের সীমানা। নতুন-নতুন রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবার সময়, যেগুলিতে দাসপ্রথা চালু ছিল সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে উত্তরের রাজ্যগুলি আপত্তি জানিয়েছে, আর দলবৃদ্ধির জন্য দক্ষিণের রাজ্যগুলি চেয়েছে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হোক। এইভাবে ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে উত্তরদক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে একটা

বিবাদ ঘনিয়ে উঠছিল। এই বিবাদ তীব্র হল মিশুরি রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে। উত্তরের রাজ্যগুলি দাবি করে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজ্য হওয়ার আগে মিশুরিকে ধীরে-ধীরে ক্রীতদাস-প্রথা বর্জনের কথা দিতে হবে। কিন্তু দক্ষিণের চাপে মিশুরিকে শেষ পর্যন্ত বিনা শর্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই সময়ে মেইন রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করে নেওয়া হয় ক্রীতদাস-মুক্ত রাজ্য হিসেবে। তখন উত্তর-দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়, পরবর্তীকালে যে-ভূখণ্ড ফ্রান্সের কাছ থেকে খরিদ করা হয় তার ৩৬০ দ্রাঘিমাংশের ঈষৎ উত্তরের ক্রীতদাস-প্রথা নিষিদ্ধ হবে, কিন্তু তার দক্ষিণে ঐ প্রথা চালু থাকতে পারবে। একে বলা হতো মিশুরি সমঝোতা। পরবর্তী চৌত্রিশ বছর এই সমঝোতার সাহায্যে মার্কিনদেশের নেতৃবৃন্দ ক্রীতদাস-প্রথার সমস্যাকে ধামাপাচা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করা যায়নি। এই প্রথাকে নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ঘনিয়ে-ওঠা বিরোধ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের চেহারা নেয়। আর এই গৃহযুদ্ধে মূল ভূমিকা নিতে হয় আব্রাহাম লিংকনকে।

লিংকন যখন মার্কিন কংগ্রেসের ইলিনয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, তখনই লেগে গেল মেক্সিকোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মূলেও ছিল ক্রীতদাস-প্রথা। যারা এই ঘৃণ্য প্রথার পক্ষে তারা চাইছিল যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় সীমার বিস্তার, যাতে নতুন-নতুন এলাকায় ক্রীতদাসের শ্রমে তুলোর লাভজনক চাষ বাড়ানো যায়। উদ্দেশ্যটা ধরতে পেরেছিলেন বলে গোড়া থেকেই লিংকন এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রায় রাজনৈতিক আত্মহত্যা করে বসেছিলেন, কারণ তাঁর রাজ্য ইলিনয় ছিল মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু ক্রীতদাস-প্রথাবিরোধী জনমতও যে ধীরে-ধীরে গড়ে উঠছে সেটাও লিংকন লক্ষ করেছিলেন। কংগ্রেস-সদস্য হিসেবে তার মেয়াদ যখন শেষ হলো তখন পুরোনো আইনব্যবসায়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া তার সমানে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। এই সময় ওরেগন রাজ্যের গভর্নরের পদ তাকে নিতে বলা হয়। কিন্তু লিংকন তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী যে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এই পদ নিলে হয়তো লিঙ্কনের জীবন ভুল পথে চলে যেত। রাষ্ট্রের রাজধানীতে কংগ্রেসসদস্য হিসেবে তিনি বেশি দিন বাস করেননি, কিন্তু এই অল্প দিনেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর মনে একটা গোটা ধারণা জন্মেছিল। এই প্রথম তিনি দেশের পূর্বাঞ্চল দেখলেন। রাজধানী ওয়াশিংটনে বসে ক্রীতদাস-প্রথার সঙ্গে তাঁর সরাসরি পরিচয় হলো, কারণ ওয়াশিংটন শহর যে-কোলাম্বিয়া জেলার অন্তর্গত সেটি ছিল দাস ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র।

কংগ্রেস-সদস্য হিসেবে যখন লিঙ্কনের মেয়াদ শেষ হলো তখন তার বয়স মাত্র চল্লিশ বছর। তখনই তিনি নিজেকে বুড়ো মানুষ মনে করতেন। আর বাস্তবিকই বয়সের তুলনায় তিনি খুব বুড়িয়ে গিয়েছিলেন। পারিবারিক অশান্তির জন্য বাড়িতে থাকবার চেয়ে ছোটো ছোটো শহরে ঘুরে, বাজে হোটেলের অখাদ্য খাবার খেয়ে ওকালতি করাই তিনি পছন্দ করতেন। যখন স্প্রিংফিল্ডে থাকতে হতো তখন বেশির ভাগ সময় অংশীদার বিলি হার্নভানের সঙ্গে দপ্তরেই কাটাতেন। আইনব্যাবসা গোড়ায় তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু এখন সেই ব্যাবসা তার কাছে ছিল নিতান্ত জীবিকা। তবে বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও বিতর্ক-দক্ষতার জন্য তিনি ভালো উকিল হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তার খ্যাতি ছিল সততার। নিজেকেই তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, ‘সব সময় সৎ থাকবে; যদি তোমার মনে হয় উকিল

হিসেবে সততা বজায় রাখতে পারছি না, তা হলে বরং ওকালতি ছেড়ে দেবে, কিন্তু সবসময় সৎ থাকবে।' উকিল হিসেবে লিংকন যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন। যখন শুরু করেছিলেন তখন তার দক্ষিণা ছিল পাঁচ ডলার, শেষে তার দক্ষিণা দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজার ডলার।

পাঁচ ডলারের উকিল হোন বা পাঁচ হাজার ডলারের, লিঙ্কনের জীবনযাত্রা ছিল একই রকম সরল। ধনী হওয়ার কোনো ইচ্ছেই। তার কোনোদিন হয়নি। তিনি বলতেন, ধনদৌলত মানেই অপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাড়াবাড়ি। স্প্রিংফিল্ডের, যে-বাড়িতে প্রেসিডেন্ট হবার আগে অবধি তিনি বসবাস করতেন, সেই বাড়িতে তিনি নিজের হাতে ঘোড়ার দেশাশুনা করতেন, গোরুর দুধ দুইতেন। জীনযাপনের এই সারল্য আব্রাহাম লিংকন শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। সেই দিক থেকে তিনি ছিলেন এক অনন্য মানুষ। লিংকন ও হার্নডনের আইন-প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে কোনোকিছুই সাজানো-গোছানো ছিল না। যেমন আইন ও অন্যান্য বিষয়ে শ'দুয়েক বই ছিল, তেমনি ঘরের মধ্যে জমা ময়লায় চারাগাছও জন্মে গিয়েছিল। তাদের হিসাবের খাতাপত্রের কোনো বালাই ছিল না। লিংকন তার মাথার লম্বা টুপির মধ্যে জরুরি কাগজপত্র গুজে রাখা পছন্দ করতেন। মাঝে-মাঝে ছেলেদের তিনি দপ্তরে নিয়ে আসতেন আর তাদের উদ্দাম হুল্লোড়কে সামলানোর কোনো চেষ্টই তিনি করতেন না। এই তারা তাক থেকে বই নামাচ্ছে, এই কলমের নিব নষ্ট করছে, সব তছনছ করছে, কিন্তু তাতে তাদের পিতৃদেবের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাইরে থেকে মনে হবে লিংকন খুব কাজের কাজ বিশেষ করছিলেন না এই সময়। কিন্তু এই সময়েই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, জেফারসনের রচনাবলির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হন। দপ্তরে যখন অবসর পেতেন, অথবা শহরে-শহরে ঘুরে আইনব্যবসায়ের ফাঁকে-ফাঁকে একটু সময় পেতেন যখন, মানসিক শৃঙ্খলা চর্চার জন্য তখন তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় খণ্ড ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিতেন। পড়তেন শেক্সপিয়রের রচনাবলি বারেবারে। সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর নাটক থেকে দীর্ঘ-দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি করে শোনাতেন ! এই সময়ে তিনি পরিচিত হন। টম পেইন ও ভোলতেয়ারের লেখার সঙ্গে, তাদের নতুন ভবনা চিন্তার সঙ্গে।

স্প্রিংফিল্ড তাঁর এই রাজনৈতিক অবসরযাপনের দিনগুলিতে শহরবাসীরা হৃদয় কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করত তাঁর কাজকর্ম। সবাই ধরে নিয়েছিল, মানুষটির অনেক যোগ্যতা ছিল, কিন্তু যোগ্যতা অনুযায়ী সাফল্য তার হলো না। পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তার একেবারেই নজর ছিল না; চলাফেরা সবকিছুর মধ্য দিয়ে তার খামখেয়ালিপনা প্রকাশ পেত। সবাই তাকে ভাবত উদ্ভট, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করত পুরোপুরি। এই আপন-মনে-থাকা মানুষটি, যা গুরুত্বপূর্ণ নয় তাকে আদৌ গুরুত্ব দিতেন না। এমন একটা গল্প আছে যে, একবার ছোটো ছেলেকে গাড়িতে বসিয়ে তিনি টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেটি যে গাড়ি থেকে পড়ে গড়াচ্ছে এবং

কাঁদছে সেদিকে খেয়াল না করে অন্যমনস্ক মানুষটি যথারীতি গাড়ি টেনেই চলছিলেন। সহযোগী হর্নডনের বর্ণনা অনুযায়ী, এই মানুষটি ছিলেন রোগা এবং ঢাঙা: লম্বা হওয়ার ফলে তিনি একটু ঝুঁকে চলতেন। বিশেষ করে তার হাত আর পা ছিল অস্বাভাবিক লম্বা। চলা ফেরা ওঠা সবই ছিল ধীরেসুস্থে। দেখে মনে হবে যেন যক্ষ্মারোগী, কিন্তু অসম্ভব শক্তি ধরতেন; সহজেই চারশো পাউন্ড, চেষ্টা করলে ছ'শো পাউন্ড পর্যন্ত ভার তুলতে পারতেন। তাঁর মুখ ছিল লম্বাটে, রোগা, শুকনো আর কুঞ্চনরেখার চিহ্নিত। সুদর্শন পুরুষ ছিলেন না তিনি, আবার কুৎসিতও বলা যেত না তাকে। আসলে তিনি ছিলেন সরল শাদাসিধে মানুষ, নিজের চালচেহারা বিষয়ে একেবারেই সচেতন ছিলেন না। নিজেকে সাধারণ মানুষ মনে করতেন, থাকতেন সাধারণের মতোই। এমনিতে সারা মুখে তাঁর বিষাদ, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যখন কোন ভিতরের আবেগে তাঁর মুখোমণ্ডল আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন জ্বলে উঠত, তখন যে-মানুষটিকে আপাতদৃষ্টিতে অসুন্দর মনে হতো তিনিই আত্মিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেন, বক্তৃতা দিতে উঠলে বদলে যেতেন তিনি চোখ ঝলমল করত, গলার স্বর অনুরণিত হতো, হাতের মুঠোয় চলে আসত শ্রোতারা। তাঁর মহিমা আর শক্তি ছিল নিরঙ্কুশ সারল্যের শক্তি ও মহিমা। অন্তর্জগতে মগ্ন এই মানুষটিকে স্প্রিংফিল্ডের নাগরিকেরা ভালোবাসত। তাঁরা জানত এই মানুষটি পাশে দাঁড়াবেন, বন্ধুহীন ও দরিদ্রকে আদালতে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন।

এই সময়ে হার্নডনের সঙ্গে লিঙ্কনের ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক হতো। হার্নডেন ছিলেন, যাকে বলা যায় উৎখাতপন্থী। অন্যায় ক্রীতদাস প্রথাকে চরম আঘাত করে একেবারে গোড়া থেকে নির্মূল করাই ছিল এই মতে বিশ্বাসী মানুষের লক্ষ্য। কিন্তু লিংকন যদিও জানতেন এই অমানবিক প্রথা অন্যায় এবং এই প্রথাকে এক সময় অপসারিত করতেই হবে, কিন্তু তবু তিনি উৎখাতপন্থীদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। উৎখাতপন্থীদের বক্তৃতায় এবং কাজে হিংসার প্রতি যে সমর্থন ছিল তা আব্রাহাম লিংকন অনুমোদন করতে পারেননি। তিনি ছিলেন ধীরেসুস্থে, রয়েসয়ে সব করার পক্ষপাতী, আইনের পথকেই তিনি পরিবর্তনের সংগত পথ বলে মনে করতেন। উৎখাতপন্থীদের মতো তিনিও চাইতেন এই ঘৃণ্য প্রথা দূর হোক, কিন্তু তিনি চাইতেন দূর হোক ধীরে-ধীরে, আইনের পথে। এবং ক্রীতদাসেরা যেহেতু মালিকের সম্পত্তি, সেই কারনে দাসদের আইনের সাহায্যে মুক্ত করবার সময় মালিকদের কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। তিনি জানতেন হঠাৎ যদি এই দাসপ্রথা উৎখাত করা যায় তা হলে মার্কিন অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেবে, কারণ কোটি-কোটি ডলার এইসব ক্রীতদাসে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। লিংকন উৎখাতপন্থী ছিলেন না, এই প্রথার অপসারণের জন্য কোনো হিংসাত্মক পথ অবলম্বনে তিনি রাজি ছিলেন না। অথচ তাঁকেই যে হিংস্র গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্রীতদাসদের মুক্তির ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল, একেই বোধহয় বলা চলে ইতিহাসের পরিহাস।

এদিকে ক্রীতদাস-প্রথার প্রশ্নটি মার্কিনদেশের রাজনীতিতে ক্রমেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এতদিন দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি রাজনৈতিকভাবে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থে তুলোর উৎপাদন বাড়ে, বিশ্বের বাজারে চাহিদাও বাড়ে। তুলোর চাষ বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ক্রীতদাসের চাহিদাও বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিস্ঠাতা নেতারা ভেবেছিলেন আস্তে-আস্তে এই অন্যায় প্রথা আপনাআপনি উঠে যাবে। সেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভাবেননি যে, তুলোর চাহিদা বাড়ার ফলে ক্রীতদাস-প্রথা আরও প্রসারিত হবে। অন্যদিকে উত্তরের রাজ্যগুলিতে এই প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তিও তীব্র হচ্ছিল। মানুষের পক্ষে অপমানজনক এই প্রথা উচ্ছেদ করবার জন্য জঙ্গি সংগঠনগুলি যে-কোনো পথের আশ্রয় নিতে আগ্রহী ছিল। কট্টর উৎখাতপন্থীরা এই প্রথা বন্ধ করবার জন্যে রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধ ঘটাতে পিছপা ছিল না। তাঁদের মতে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা ঈশ্বর প্রদত্ত আইনের অঙ্গ, আর সেই আইন মানুষের তৈরী রাষ্ট্রের আইনের চেয়ে বড়ো। ১৮৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যায়, অর্থনৈতিক শক্তিতে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে ছাড়িয়ে গেল। সম্পদ আর লোকসংখ্যায় উত্তরের শক্তি ক্রমেই বাড়ছিল, আর দক্ষিণ ততই আতঙ্কিত হচ্ছিল। ফলে, নতুন-নতুন রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে যেমন আগে বলেছি, দুই পক্ষে বিবাদ বাধছিল। রাষ্ট্রের উপর কে আধিপত্য করবে।— দক্ষিণ, না উত্তর— এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল দাসপ্রথা বজায় রাখা বা উচ্ছেদ করার নৈতিক প্রশ্নটি।

এই সময় আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবননাট্যে জনৈক স্টিফেন ডগলাসের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। সবদিক থেকে ডগলাস আর লিংকন ছিলেন দুজন দুজনের উলটো। লিংকন যখন একজন অপরিচিত আইনজীবী, তখনই ডগলাস একজন সুপরিচিত সফল মানুষ। লিংকন রীতিমত লম্বা, ডগলাস বেঁটেখাটো। ডগলাস সবসময় লড়াকু, লিংকন ধীরস্থির। ডগলাস বোলচালে লোকজনকে মুগ্ধ করায় দক্ষ, অন্যদিকে লাজুক লিংকন সবসময় অপ্রতিভ। লিংকন ধীরগামী শান্ত আর ডগলাস ছিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার। এই ডগলাস মার্কিন কংগ্রেসের সিনেটে কানসাস-নেব্রাস্কা আইন পাশ করিয়ে নেন চালাকি করে। তার ফলে, মিশুরি বোঝাপড়ার সাহায্যে যে-ক্রীতদাসপ্রথার প্রশ্ন রাজনীতিবিদরা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন সেটা আর চাপা রইল না। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মিশুরি

বোঝাপড়ায় স্থির হয়েছিল, নতুন-কেনা ভূখণ্ডের রাজ্য ৩৬° দ্রাঘিমাংশের ঈষৎ উত্তরের হলে সেই রাজ্য দাসপ্রথামুক্ত হবে। কিন্তু ডগলাসের নেতৃত্বে পাশ-করা নতুন আইনে বলা হলো কানসাস ও নেব্রাঙ্কা রাজ্যে দাসপ্রথা থাকবে কি থাকবে না সেটা ঠিক করবে সেখানকার বাসিন্দারা।

উত্তরের রাজ্যগুলিকে এই আইনের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিল। কারণ এই আইন গণতন্ত্রের নামে একটা অন্যায় প্রথাকে বিস্তারের সুযোগ করে দিচ্ছিল। পত্রিকার সম্পাদকেরা, যাজকেরা, অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা তীব্র আপত্তি জানালেন। উত্তরের রাজ্যগুলির শহরে শত—শত সভাসমিতিতে এই আইনের নিন্দা করা হলো। এই উত্তেজনার দিনগুলিতে ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল হ্যারিয়েট বিচার স্টেটা নামী এক মহিলার লেখা উপন্যাস "আংকল টমস কেবিন" যে বই বা তার বঙ্গানুবাদ 'টমকাকার কুটির', তোমরা কেউ-কেউ পড়ে থাকতে পারো। এই উপন্যাসে একটি নিগ্রো ক্রীতদাস পরিবারের মর্মান্তিক বেদনার কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। এই উপন্যাসের অসামান্য জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে কীভাবে এই ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে যেমন বলা হয় দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" নাটকের জন্য নীলচাষের উচ্ছেদ হয়, তেমনি মার্কিনদেশে বলা হতো যে 'আংকল টমস্ কেবিন'-এর জনপ্রিয়তার জন্যই সেখানে ক্রীতদাস-প্রথা উঠে যায়। ডগলাসের আইনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠায় উৎখাতপন্থীদের হিংসাত্মক বক্তব্য এবং জনসমর্থন পেতে থাকে, মানুষেরা আইন না মেনে পলাতক ক্রীতদাসদের আশ্রয় দিতে থাকে। দক্ষিণে জনপ্রিয়তার বদলে ডগলাস উত্তরাঞ্চলে পেলেন মানুষের ঘৃণা। তাঁকে শয়তানের প্রতিমূর্তি হিসেবে চিত্রিত করা হলো, তাঁর কুশপুতুল পোড়ানো হলো। তাকে জুডাসের সঙ্গে তুলনা করা হলো, যে-জুডাস ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার লোভে যিশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

আব্রাহম লিংকন এই তর্কাতর্কির পরিস্থিতিতে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। ঝেড়ে ফেললেন সব আলস্য আর জড়তা। রাজনৈতিক কাজকর্মে আবার উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিতে শুরু করলেন। স্প্রিংফিল্ডের এই আইনজীবী নিজের পশারের ক্ষতি করেও মার্কিনদেশের ইতিহাস, বিশেষ করে ক্রীতদাস-প্রথার ইতিহাস, পড়াশোনা কের যেন তাঁর জীবনব্রতের জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রথমেই তিনি ডগলাসের সঙ্গে তর্কে নামলেন।

ডগলাস বললেন, কেন তিনি কানসাস-নেব্রাস্কা আইন সমর্থন করেছেন। লিংকন তাঁর বিরুদ্ধে বলতে উঠে জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা দিলেন। মার্কিনদেশে দাসপ্রথার ইতিহাস বর্ণনা করে যুক্তি আর তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর কুশলী প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে ছিন্নভিন্ন করলেন। ঠিক এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলো দাসপ্রথা-বিরোধী রিপাবলিকান পার্টি, যে-পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পরে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য দাঁড়াবেন। ইতিমধ্যে কানসাস রাজ্যে দাঙ্গার উপক্রম হলো। অন্যায় ভোটে সেখানকার নির্বাচনে দাসপ্রথার সমর্থকেরা জয়ী

হয়েছিল। অন্য পক্ষ এই অন্যায় নির্বাচন মেনে নিতে পারেনি। গৃহযুদ্ধের ভূমিকা রচিত হলো কনসাসে। এক মার্কিন নাগরিক অন্য মার্কিন নাগরিককে এই প্রশ্নে খুন করতে উদ্যত হলো যে কৃষ্ণকায় নিগ্রো কি একজন মানুষ, নাকি সে নিতান্ত একটি পশু। এই সময়ে লিংকন একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'জাতি হিসেবে যাত্রার মুহূর্তে আমরা বলেছিলাম সব মানুষ সমান। এখন আমরা কার্যক্ষেত্রে বলছি, নিগ্রো ব্যতিরেকে সব মানুষ সমান।" যদি এই কথাই সত্য হয় তা হলে বরং এমন দেশে তিনি চলে যাবেন যেখানে একনায়কতন্ত্র একচ্ছত্র, যেখানে মানুষের স্বাধীনতার কথা উচ্চারণের ভান নেই। এই মুহূর্তে কালোরা সব বিষয়ে তার সমকক্ষ না-ও হতে পারে, কিন্তু লিংকন মনে করতেন নিজের শ্রমে যা-কিছু উপার্জিত তার ভোগে কালো মানুষদের অধিকার অন্য যে কোন মানুষের সমান। রাজনীতি এড়িয়ে আইনজীবীর জীবনযাপন করা আব্রাহাম লিঙ্কনের পক্ষে আর সম্ভব হলো না। তিনি নতুন সংগঠিত রিপাবলিকান দলে যোগ দিলেন। ১৮৫৬ সালে ঐ দলে ইলিনয় রাজ্যসম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। যারা ইলিনয় রাজ্যে সকলে তাঁকে চিনত, পছন্দ করত, শ্রদ্ধা করত। যদিও তিনি ক্রীতদাস-প্রথার বিরোধী ছিলেন, তবু মধ্যপন্থী হিসেবে কোনো খুনখারাবির সমর্থক ছিলেন না। নানা বিচিত্র মতের মানুষে নিয়ে গড়ে-ওঠা রিপাবলিকান দলের বেশির ভাগ সদস্যের কাছে এইরকম মানুষ ছিলেন গ্রহনযোগ্য। কানসাসের হাঙ্গামা নিয়ে সম্মেলনে যদিও খুব উত্তেজনা ছিল, তবু লিঙ্কনের নেতৃত্বে মধ্যপন্থারই জয় হয়। তাকে বক্তৃতা দিতে ডাকা হলে, তিনি দিলেন এ-যাবৎকালের তাঁর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। তিনি কনসাসের হাঙ্গামার নিন্দা করলেন, কানসাস-নেব্রাস্কা আইনের বিরোধিতা করে মিশুরি বোঝাপড়া আবার চালু করবার দাবি জানালেন এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে সতর্ক করে, ঘোষণা করলেন, "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হব না, তোমরাও হতে পারবে না।" সবাইকে সহনশীল হতে আবেদন করে যখন বক্তৃতা শেষ করলেন, তখন সারা সভা হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল। সহযোগী হার্নডন বলেছেন, এইদিন মনে হলো লিংকন যেন সাত ফুট দীর্ঘ এক মানুষ। এই বক্তৃতা তাকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। ফিলাডেলফিয়ায় রিপাবলিকান দলের জাতীয় সম্মেলনেও লিংকন যোগ দিয়েছিলেন। সেই সম্মেলনে জন ফ্রেমন্টকে দলের রাষ্ট্রপতিপদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়। লিংকনকে উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের একটা চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

নির্বাচনে কিন্তু রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ফ্রেমন্ট হেরে গেলেন। জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট হলেন ডোমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জেমস বুকানন। উত্তরাঞ্চলের রাজ্য পেনসিলভেনিয়ার বাসিন্দা হয়েও বুকানন ছিলেন ক্রীতদাস-মালিকদের সমর্থক। বুকানন ছিলেন একজন দুর্বল প্রকৃতির মানুষ; উদ্যোগের বালাই নেই, দেশ চালানোর ক্ষমতা নেই। ইতিহাস তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। এমন সংকটকালে রাষ্ট্রনায়ক হলেন বুকাননের মতো মানুষ, দেশের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্যের

ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। ইতিমধ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট মিশুরি সমঝোতাকে বেআইনি এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বে কালো মানুষদের কোনো অধিকার নেই ঘোষণা করলে উত্তরাঞ্চলে ক্ষোভ বেড়ে গেল। এই সময় লিংকন আবার ডগলাসের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়লেন। ডগলাস স্প্রিংফিল্ডে একটি বক্তৃতায় বললেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রমাণ করেছে কানসাস-নেব্রাস্কা আইনের বিরোধিতা করা নিরর্থক। জনগণই স্থির করবে কোন রাজ্যে দাসপ্রথা থাকবে অথবা থাকবে না। তা ছাড়া তিনি কালো মানুষ আর শাদা মানুষের সমতার বিরোধী। কারণ, কালোদের সমানাধিকার দেবার অর্থ হবে, সব কালোকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া, তাকে ভোটাধিকার এবং পদে নির্বাচিত হবার অধিকার দেওয়া, শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গের অসবর্ণ বিয়ের অধিকার দেওয়া। ভগলাস প্রশ্ন করলেন, রিপাবলিকানরা জিতলে কালো চামড়ার মানুষেরা এইসব অধিকার পাবে, এই পরিণতি কি ইলিনয় রাজ্যের মানুষ মেনে নেবে? ইতিমেধ্য কানসাস রাজ্যে ক্রীতদাসপ্রথার সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে দাঙ্গায় মারা যায় দুশো মানুষ। সেখানে ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থনে এক গঠনতন্ত্র পাশ করানো হয়েছিল চালাকি করে। কিন্তু কানসাসের মানুষ সেই গঠনতন্ত্রকে মানে না। প্রেসিডেন্ট বুকানন সেই প্রত্যাখ্যাত গঠনতন্ত্রকে পাশ করাবার দ্বিতীয়বার চেষ্টা করলে দ্বিতীয়বারও নাগরিকেরা বিপুলভাবে বিরুদ্ধে ভোট দেয়। দাসপ্রথা বিষয়ে জনগণের রায়ই শেষ কথা হবে বলেছিলেন ডগলাস, কিন্তু বুকানন জনগণের সিদ্ধান্তকে উলটে দেবার চেষ্টা করায়, নিজে বুকাননের বিরোধিতা করেন। যে-ডগলাস এতদিন ছিলেন দক্ষিণের ক্রীতদাস মালিকদের বন্ধু, তিনি এবার তাদের মুখোশ খুলে দিতে লাগলেন সুযোগ পেলেই। গোটা দেশের মানুষ দক্ষিণাঞ্চলের চালাকি আর বাড়াবাড়ি বুঝতে পারেন।

কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের নেতারা যতই রাজনৈতিক চালাবাজি করুক, উত্তরাঞ্চল জিতে যাচ্ছিল ভিতরে-ভিতরে। এই সময়কার সত্যকার ইতিহাস লেখা হচ্ছিল বণিকদের সভায়, ব্যাংকে, দালালদের দপ্তরে, কলকারখানায়। রাজনৈতিক বক্তৃতা আর সভাসমিতির লড়াই তো আসলে ছায়াবাজি; ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিতে আসল লড়াইয়ে জয়ী হয়ে অর্থনৈতিক শক্তিতে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি বলীয়ান হয়ে উঠছিল। ভিতরে-ভিতরে এই জয়ই আব্রাহাম লিংকনকে জয়ী করেছিল; অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নৈতিক শক্তি। হঠাৎ সময়ের গতি যেন দ্রুত বেড়ে গেল। ডগলাস ও লিঙ্কনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো খোলাখুলি— গোড়ায় মার্কিন কংগ্রেসের সিনেটে ইলিনয়ের সদস্যপদ নিয়ে, পরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদ নিয়ে। ১৮৫৮ সালের জুনে রিপাবলিকান দলের রাজ্যসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে লিংকনকে মার্কিন সিনেটের পদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হলো। সেদিন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতায় দেশবাসীর সামনে মূল প্রশ্নগুলি তুলে ধরলেন আব্রাহাম লিংকন। ক্রীতদাস-মালিকদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তিনি ব্যাখ্যা করলেন এবং পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, ডগলাসকে যেন

ক্রীতদাস প্রথা বিরোধীদের বন্ধু বলে মনে না করা হয়। তিনি জানালেন, বিভক্ত ইমারত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; অর্ধেক স্বাধীন, অর্ধেক পরাধীনভাবে কোনো দেশ স্থায়িত্ব পেতে পারে না। তিনি আশা করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইমারতের পতন হবে না, শুধু তার বিভক্ত অবস্থার অবসান হবে। হয় দাসপ্রথার বিরোধীরা এই প্রথার বিস্তার রুখে দেবে, অথবা এই প্রথার সমর্থকেরা দেশের সব রাজ্যে এই প্রথার বিস্তার ঘটাবে।

লিঙ্কনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ডগলাস বললেন যে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন দেশের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন হবে, কিন্তু লিংকন সেই স্বাধীনতা খর্ব করতে চান, তিনি চান সব রাজ্য একই রকম প্রথা বা নিয়ম মেনে চলবে। বত্রিশটি স্বাবলম্বী অঙ্গরাজ্যকে লিংকন একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করতে চান। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার শাদা চামড়ার সরকার, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে শাদা চামড়ার মানুষ, শাদা চামড়ার মানুষের জন্যে। ডগলাস স্পষ্টই জানালেন, তিনি কালো চামড়ার মানুষের সমানাধিকারের বিরোধী। নিচুজাতের সঙ্গে উঁচুজাতের মিশ্রণ হতে পারে না।

দুই বছর ধরে দুজনের বিতর্ক চলেছে। নিচুজাতের যুক্তিকে তীব্রবাবে আক্রমণ করলেন লিংকন। তিনি জানালেন, যুগযুগ ধরে রাজারা-প্রজারা নিচুজাত, অযোগ্য— এই যুক্তিতে তাদের অধিকারহীন দাস করে রেখেছিল। সম্রাজ্যবাদীরাও অন্যদেশের মানুষকে শাসন করবার সময় একই যুক্তি দিয়ে থাকে ; বলে, অধীনদেশের মানুষ অযোগ্য, নিচুজাত। গণতন্ত্রপ্রেমীরা এই যুক্তি মানেনি। সেই বর্জিত প্রত্যাখ্যাত যুক্তি কি আজ আমরা মানব, কালো চামড়ার মানুষের ক্ষেত্রে? মার্কিনরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল মানুষমাত্রেই সমান। আজ যদি বলি, কালো মানুষ ছাড়া মানুষমাত্রেই সমান, তা হলে ভবিষ্যতে সমানাধিকার থেকে অন্য জনগোষ্ঠীকেও বাদ দেবার সুযোগ করে দেওয়া হবে। লিংকন বললেন, প্রশ্ন একটাই সারা দুনিয়ায় যুগযুগ ধরে ভালো-মন্দের মধ্যে একটা লড়াই চলেছে, দীর্ঘদিন চলবে। একদিকে সাধারণ মানুষের মুক্তির অধিকার, নীতি হলো “তুমি কাজ করো, পরিশ্রম করো, উৎপাদন করো, আমি ভোগ করি।” কোনো রাজার বা অন্য যে-কোনো মানুষের মুখ থেকে এই নীতি উচ্চারিত হোক-না কেন, এ হলো অন্য জাতিকে ক্রীতদাস করে রাখবার যুক্তি, অত্যাচারের যুক্তি। এইসব বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমরা লিঙ্কনের ক্রমপরিণত মনের পরিচয় পাই। যেমন গভীর হচ্ছিল তাঁর বক্তব্য, তেমনি সেই বক্তব্যকে প্রকাশের যথাযোগ্য ভাষাশৈলী তিনি অর্জন করছিলেন। যে-মানুষ একদিন বিখ্যাত গেটিসবর্গ বক্তৃতা দেবেন, ধীরে-ধীরে, তাঁর জন্ম ও বিকাশ যেন আমরা এইসব বক্তৃতায় শুনতে পাচ্ছিলাম।

দুই পক্ষের বিতর্ক-বিবাদ হলো তীব্র থেকে তীব্রতর। এই সময় প্রস্তাব করা হয়, দুই প্রতিপক্ষ একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি তাদের কথা বলুক, বিতর্ক করুক। এই প্রস্তাব ডগলাস মেনে নিলেন, যদিও এই বিতর্কে তার কোনো লাভ

ছিল না। ডগলাস ইতিমধ্যেই সুপরিচিত ছিলেন, এই বিতর্কে তাঁর প্রচার বাড়বে না। কিন্তু লিংকন অনেক সুবিধা হবে।

দক্ষিণাঞ্চলে কালো চামড়ার ক্রীতদাসের চাহিদা বাড়ছিল। তুলোর চাহিদা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তুলো-চাষের জমি প্রসারিত হচ্ছিল, আর নতুন জমিতে চাষের জন্য দাস-শ্রমিকের চাহিদাও বাড়ছিল। আফ্রিকা থেকে নতুন ক্রীতদাস আমদানি নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে, নৌবাহিনীর পাহারা এড়িয়ে, মৃত্যুদণ্ডের ভয় উপেক্ষা করে, আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের আনা হচ্ছিল জাহাজে। আনা হচ্ছিল, কারণ এই ব্যাবসা ছিল খুব লাভের। আফ্রিকায় যে-মানুষটিকে কেনা হতো পঞ্চাশ ডলারে, তাকে মার্কিন দেশে ক্রীতদাস হিসেবে বেচা যেত পাঁচশো ডলারে। এইসব যখন গোপনে-গোপনে, আসলে তত গোপনেও নয়, চলছে, তখন গোপনে দুঃখ-ক্ষোভ লালন না করে প্রকাশ্য বিদ্রোহে ফেটে পড়লেন জন ব্রাউন নামে এক কালো চামড়ার বুড়ো মানুষ। বেশ কিছুদিন ধরেই মালিকদের খপ্পর থেকে পালিয়ে কিছু দুঃসাহসী কালো মানুষ ক্যানাডায় আশ্রয় নিচ্ছিল।

এইরকম কিছু মানুষকে জড়ো করে জন ব্রাউন ১৮৫৯ সালের অক্টোবরে হারপারের ফেরি দখল করে নিলেন। এক দিনই তিনি শহরটি দখল রাখতে পেরেছিলেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে পরাস্ত করেন, পরে গৃহযুদ্ধে যিনি দক্ষিণাঞ্চলের সেনাপতি হবেন, সেই রবার্ট লি। এই ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহ মার্কিনদেশের উত্তরে-দক্ষিণে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত অন্যায়ের ফলে এই ফেটে পড়ায় শ্বেতাঙ্গরা আতঙ্কিত হয়। আহত জন ব্রাউন বিচারকালে এতই অকুতোভয় ছিলেন যে, বিরোধীরাও তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়। ঐ বছরের ডিসেম্বরে তার ফাঁসি হয়। ফাঁসির আগে জন ব্রাউন বলেছিলেন, কৃষ্ণকায়দের উপর অত্যাচারের অপরাধে অপরাধী রাষ্ট্রের অন্যায় একমাত্র রক্ত দিয়েই মুছে দেওয়া সম্ভব হবে। পরে সত্যিই তা-ই হয়েছিল। এই অপরাধ গৃহযুদ্ধের রক্তধারা দিয়ে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। ডগলাস জয়ী হলে তাঁর খ্যাতি বা কৃতিত্ব বাড়বে না, লিংকন জয়ী হলে সেটা হবে তাঁর পক্ষে বিরাট জয়। ছোটো-ছোটো শহরে মোট সাতটি বিতর্কসভা বসে। এই বিতর্ক যে-কারণে আয়োজিত হয়েছিল সেই সিনেট-নির্বাচনে ডগলাস জয়ী হলেন বটে, কিন্তু লিংকন এই সুযোগে জাতীয় রাজনীতির মাঝখানে চলে এলেন। এতই তাঁর পরিচিতি বেড়ে গেল যে তারই ফলে ১৮৬০ সালে রিপাবলিকান দলে প্রার্থী হিসেবে লিংকন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনীত হবেন। ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা

রোগা শরীর নিয়ে, বিষন্ন মুখ নিয়ে একটু বুকে তিনি মঞ্চে দাঁড়াতেন, পিছনে থাকত হাত জোড়া। গোড়ায় মনে হতো অপ্রস্তুত, কিন্তু বলতে-বলতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতেন তিনি। লিঙ্কনের বক্তৃতায় কোনো নাটুকেপনা ছিল না; কোনো চমকসৃষ্টির চালাকি বা ভানের আশ্রয় নিতেন না তিনি। তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথা বলতেন শান্ত ভঙ্গিতে। অত্যন্ত মর্যাদামণ্ডিত ছিল তার স্বাভাবিক বলবার ভঙ্গি।

জন ব্রাউনের ফাঁসির দিন কবি লংফেলো ডায়েরাতে লিখেছিলেন, ঝড়ের বীজ বোনা হলো, পরিণতি হবে ঘূর্ণিঝড় এবং তার আর দেরি নেই। ফাঁসির মঞ্চে ব্রাউনকে যে-সৈনিকেরা নিয়ে যায়। তার মধ্যে একজন ছিল জন উইলকিস বুথ, যে কয়েক বছর পরে লিংকনকে হত্যা করবে। জন ব্রাউনকে নিয়ে এই গান বিখ্যাত হয়েছিল,

John Brown's body amouldering in the grave.
But his soul, goes marching on.

তোমরা সুযোগ পেলে মার্কিন কালো চামড়ার গায়ক পল রোবসনের রেকর্ডে-ধৃত অমর কণ্ঠে এই গান শুনে নিয়ো।

স্বজাতির প্রতি উৎপীড়ন এমন বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহে দূর করা যাবে না বলে জন ব্রাউনের বিদ্রোহকে লিংকন সমর্থন করেননি। কিন্তু তিনি দ্বিধাহীন স্বরে ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থনে দক্ষিণের রাজ্যগুলির সমস্ত উদ্যোগের নিন্দা করলেন। তারা চায় ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধতা বন্ধ হোক, ক্রীতদাস-প্রথাকে ন্যায্য বলে ঘোষণা করা হোক। অপরপক্ষে লিংকন বললেন, ন্যায়ের পথই হবে শক্তির পথ। যে-লিংকন এতদিন মধ্যপন্থী ছিলেন, ধীরে-ধীরে ঘটনা-পরম্পরার চাপে তিনি দকিখণের রাজ্যগুলির সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে এসে গেল ১৮৬০ সালের রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচন। সবাই বুঝতে পারছিল ভোটের ফল যদি তাদের বিপক্ষে যায় তা হলে দক্ষিণের ক্রীতদাস-মালিকেরা অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। এবার নির্বাচনে দলের ভূমিকাও গৌণ হয়ে যাচ্ছিল, কেননা প্রধান দল দুটির— রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক-মধ্যে ক্রীতদাস প্রশ্নে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। কানসাস রাজ্যের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকায় ডগলাসের উপর আস্থা হারিয়েছিল দক্ষিণের ডেমোক্রেটিক নেতৃবর্গ। তাই দক্ষিণে ঐ পার্টির সদস্যরা ব্রেকিনরিজ বলে একজনকে প্রেসিডেন্টপদের জন্য প্রার্থী মনোনীত করল। উত্তরের ডেমোক্রেটিক সম্মেলনে ডগলাস মনোনীত হলেন প্রার্থী। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী কে হবেন তা দল ঠিক করতে পারছিল না। ১৮৫৯ সালের শেষে কে কে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হতে পারেন। সেই বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তিকার একুশ জনের মধ্যে লিঙ্কনের নামও ছিল না। মনে করা হচ্ছিল দলনেতা সিওয়ার্ডের অথবা ওহিয়ো রাজ্যের সালমান চেজের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সমস্ত আন্দাজকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত

বিপুল ভোটে আব্রাহাম লিংকন রিপাবলিকান দলের হয়ে রাষ্ট্রপতিপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনীত হলেন।

দলের নেতারা হয়তো ভেবেছিলেন সকলের কাছে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য এই মানুষটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কথা মেনে চলবেন। লিস্কনের মনোনয়নকে কামান দেগে অভ্যর্থনা জানানো হলো ! অল্প দিন পর থেকে কামানদাগা চলতেই থাকবে, কেননা শুরু হবে গৃহযুদ্ধ। নির্বাচনী প্রচার শুরু হলো, লড়াই শুরু হলো তিন প্রার্থীর মধ্যে। লিংকন নিজে অংশ নিলেন না এই প্রচারে, বক্তৃতা দিয়েও বেড়ালেন না। পুরো সময়টা কাটালেন স্প্রিংফিল্ডে। এই সময় গ্রেস বেডেল বলে একটি মেয়ে তাকে লেখে, যে উঁচু পদে তিনি অধিষ্ঠিত হতে চলেছেন তাতে মুখে দাড়ি গজালে তার মুখটি ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ও মহিমান্বিত দেখাবে। ছোট্ট মেয়েটির পরামর্শে এই সময় তিনি দাড়ি রাখতে শুরু করেন। ভোটের ফল বেরোলে দেখা গোল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভোট দুই ভাগ হওয়ায় লিঙ্কনের জয় সহজ হয়েছে। আবার দেখা গোল ক্রীতদাস-প্রথা-বিরোধী ভোট পড়েছে বিপক্ষের চারগুণ বেশি। কারণ লিঙ্কনের ভোট আর ডগলাসের পক্ষের ভোটে দুটোই ছিল ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধ ভোট । আব্রাহাম লিংকন পেয়েছিলেন। ১৮৬৬,০০০ ভোট, ডগলাস ১,৩৭৭,০০০ ভোট আর ব্রেকেনরিজ মাত্র ৮৫০,০০০ ভোট। প্রেসিডেন্টপদে নির্বাচিত হলেন গরিবঘর থেকে উঠে আসা লিংকন।

জয়ী হলেন লিংকন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবার আয়োজন। শুরু হলো বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে সভাসমিতি, স্বেচ্ছা-সৈনিক ও অস্ত্রসংগ্রহ শুরু হলো, চাঁদা তোলা শুরু হলো। আরম্ভ হলো গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সমর্থন চেয়ে যোগাযোগ করা হলো। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সব দেখছিলেন আর অপেক্ষা করছিলেন। শাসনভার তখনও প্রেসিডেন্ট বুকাননের হাতে। দক্ষিণের রাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার বুকানন অস্বীকার করলেন কিন্তু প্রতিরোধের কোনো আয়োজনই তিনি করলেন না। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন লিংকন প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হবার সুযোগই পাবেন না। কারণ বুকানন বারে-বারে ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট। অর্থাৎ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, উত্তরের রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটা, আর দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে নিয়ে আলাদা অন্য একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠতেই যাচ্ছে। এই সময় উত্তরাঞ্চলের কেউ-কেউ চাইছিলেন, বিশেষ করে উৎখাতপন্থীরা, যে, ক্রীতদাস-প্রথার দূষিত ক্ষত নিয়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলি যদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তবে তা-ই যাক। শুধু উত্তরের রাজ্যগুলিকে নিয়ে নতুন যুক্তরাষ্ট্র হোক একেবারে দাসপ্রথামুক্ত। আবার কেউ-কেউ চাইছিলেন মিশুরি বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে দক্ষিণের সঙ্গে নতুন একটা মীমাংসায় আসতে। লিংকন প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করবার আগেই সর্বপ্রথম দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করে। এর আগেও একবার ১৮৩২ সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ নেয়। সেবার প্রেসিডেন্ট অ্যানড্রু জ্যাকসনের কঠোর মনোভাবের ফলে সে-উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। দক্ষিণ ক্যারোলিনার বিচ্ছিন্নতাবাদী পথ অনুসরণ করল মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, আলাবামা, জর্জিয়া, লুসিয়ান এবং টেকসাস রাজ্যগুলি পরপর। এই রাজ্যগুলি ১৮৬১ সালের মার্চে সংঘবদ্ধ হয়ে নতুন এক রাষ্ট্র গড়ে তুলল। সেই রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হলো “কনফেডারেট স্টেটস অভ আমেরিকা’। এই নতুন রাষ্ট্রের ঘোষণাপত্রে বলা হলো, কালোরা শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ নয়; উচ্চজাতির অধীনস্থ থাকাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই বাস্তব, দার্শনিক, নৈতিক সত্যই হলো নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি। পরে এই নতুন রাষ্ট্রে যোগ দেয়। উত্তর ক্যারোলিনা, টেনেসি, আরাকানসাস, ভার্জিনিয়া। অর্থনৈতিকভাবে

ক্রীতদাস-প্রথার উপর নির্ভরশীল এই মোট এগারোটি রাজ্য একত্র হয়ে প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

প্রথম সাতটি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেল লিংকন প্রেসিডেন্ট হয়ে শাসনভার গ্রহণ করবার আগেই, তিনি শাসনভার গ্রহণ করবেন এই আশঙ্কায়। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, অন্যের সম্মতি ছাড়া কোনো রাজ্যের আইন-সংগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার নেই এবং রাষ্ট্রপতি ও সরকারের অন্যান্য উচ্চ পদাধিকারীদের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রকে আগের মতোই চালনা করা। আগে তিনি ক্রীতদাস-মালিকদের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত বোঝাপড়ায় যেতে রাজি ছিলেন। মধ্যপন্থী ছিলেন তিনি, হিংসার পথ পরিহার করতে চেয়েছিলেন, সর্বাধিক মানুষের সম্মতিতে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। দাসপ্রথা যেখানে আছে থাকুক, কিন্তু অন্য জায়গায় এই কুপ্রথাকে বিস্তার করা চলবে না— এই ছিল গোড়ায় তার অভিমত, যদিও এই প্রথা যে নৈতিকভাবে অন্যায় তা তিনি জানতেন। তিনি মনে করতেন একটা বিশেষ অঞ্চলে যদি সীমাবদ্ধ থাকে, অন্য জায়গায় যদি ছড়াবার সুযোগ না পায় তা হলে ক্রীতদাস-প্রথা এক সময়ে মুছে যাবে। কিন্তু দক্ষিণের রাজ্যগুলির নীতিহীন জেদ তার মনোভাবকে কঠোর করে তুলেছিল এবং তিনি শপথ করেছিলেন এই অন্যায় প্রথা তুলে দেবেনই।

ইতিমধ্যে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বহু চাকরির উমেদারদের দ্বারা প্রায় ঘেরাও হয়ে স্প্রিংফিল্ডে দিন কাটাচ্ছিলেন। ছোট-বড়ো চাকরির জন্য সবই মিলে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। চাকরির তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেককেই তিনি বিমুখ করতে বাধ্য হন। একজন নাছোড় পদপ্রার্থীকে তিনি বলেন, শুয়োর-মায়ের দুধের বোঁটা যত, তার বাচ্চার সংখ্যা যদি তার চেয়ে বেশি হয়, তা হলে দুধ-বিনা সেই বাড়তি বাচ্চাকে কাঁদতে হবেই। প্রেসিডেন্ট পদে অভিষেকের আগে লিংকন দেখা করতে গেলেন তাঁর স্নেহময়ী বিমাতা সারার সঙ্গে। নিংকন গুপ্তহত্যায় নিহত হবার পর হার্নডনকে এই মহিলা চোখের জলে বলেছিলেন, লিংকন যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি অভিভুত হয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুকালে যদি তাঁর নিজের মৃত্যু হতো তা হলে তিনি সুখী হতেন। তিনি চাননি লিংকন রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হোন। লিংকন যখন তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন এক অজানা আশঙ্কায় তার মন উদ্বেল হয়েছিল। মনে হয়েছিল লিঙ্কনের কোনো বিপদ হবে এবং এই দেখাই তার সঙ্গে শেষ দেখা। স্নেহের আতিশয্যে এইভাবে আমরা প্রিয়জনের বিপদ আশঙ্কা করি। লিংকন নিজেও তার নিয়তির অশুভ পূর্বাভাস পেয়েছিলেন নির্বাচনে জয়ের কয়েকদিন পরে। আয়নায় তাকিয়ে দেখলেন যেন তাঁর দুটো ছবি: একটা স্পষ্ট, অন্যটা অস্পষ্ট ছায়াময়। তাঁর স্ত্রী শুনে ব্যাখ্যা করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ হবে না। নির্বাচনের আগে থেকে হত্যার ভয় দেখিয়ে লেখা অনেক চিঠি লিংকন পেতেন; আমৃত্যু পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিয়তিবাদী হয়ে পড়েছিলেন। বলতেন, যতই

লোহার বর্ম পরি বা যতই পাহারাদারেরা আমাকে ঘিরে থাকুক-না কেন, কেউ মারতে চাইলে, মারবেই।

রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের জন্য তিনি স্প্রিংফিল্ড থেকে ওয়াশিংটন নগরের পথে যাত্রা করলেন। যাত্রার আগে সব মালপত্রে নিজের হাতে ঠিকানা-লেখা লেবেল সেঁটে দিলেন : এ. লিংকন, রাষ্ট্রপতি-ভবন, ওয়াশিংটন। যাত্রার আগে স্টেশনে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় বললেন, যে-গুরুদায়িত্ব তিনি নিতে চলেছেন, সেটা সম্ভবত প্রথম রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন যে-দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার চেয়েও বেশি। ঈশ্বরের কৃপা পেলে তাঁর অসফল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ১৮৬১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি যখন তিনি ওয়াশিংটনের পথে নিউ ইয়র্কে, তখন তিনি খবর পেলেন জেফারসন ডেভিস নতুন কনফেডারেট স্টেটস অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন। যাত্রাপথেই তাকে হত্যার চেষ্টা করা হবে এমন গোপন খবর পেয়ে তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাজধানী ওয়ামিংটনে নিয়ে আসা হয়। পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী স্টিফেন ডগলাস তাঁর সঙ্গে দেখা করে হাত ধরে বললেন, 'আমরা বহু বছরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ও তার গঠনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যে আমরা একমত। এই যুক্তরাষ্ট্র ও তার গঠনতন্ত্রকে কিছুতেই ধ্বংস হতে দেওয়া চলবে না।'

চৌঠা মার্চ রাষ্ট্রপতিপদে আব্রাহাম লিঙ্কনের উদ্বোধনের দিন বিদায়ী রাষ্ট্রপতি বুকানন তাকে হোটেল থেকে নিতে এলেন। প্রশস্ত পেনসিলভেনিয়া সড়ক দিয়ে চলল তাঁদের গাড়ি। গাড়ি ঘেঁষে অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী পাহারা দিয়ে চলল আর দুপাশের বাড়িগুলোর মাথায় রাইফেলধারী সৈন্যেরা পাহারায় সতর্ক হয়ে থাকল। বক্তৃতার মঞ্চে এগিয়ে গেলেন লিংকন। চিরকালের অপ্রস্তুত লিংকন বুঝে উঠতে পারছিলেন না কোথায় রাখবেন তার টুপি আর কোথায় রাখবেন লাঠি। লাঠি রাখলেন এক কোনায়, শেষ পর্যন্ত তাঁর বিব্রত অবস্থা বুঝে হাত থেকে মৃদু হেসে টুপিটা নিলেন সেই দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ডগলাস। তারপর লিংকন ধীরে-ধীরে পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করলেন তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা। যেসব রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যায়নি, সেগুলি যাতে বেরিয়ে না যায়, সেজন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন তিনি। দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে এখনও কথা দিলেন সীমানার মধ্যে প্রচলিত দাসপ্রথার তিনি বিরুদ্ধতা করবেন না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো রাজ্যের বেরিয়ে যাওয়া মেনে নেবেন না। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, দক্ষিণের বিদ্রোহী রাজ্যগুলিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সম্পত্তি, বিশেষ করে দুর্গগুলি তিনি রক্ষা করবেনই।

বক্তৃতার শেষে প্রধান বিচারপতি এসে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করালেন। নতুন প্রেসিডেন্ট কার্যকালের সূচনা জানিয়ে কাছেই কামান গর্জন করে উঠল। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করলেন। যে-মানুষটি কয়েক সপ্তাহ আগে স্প্রিংফিল্ড থেকে রওনা হয়েছিলেন আর যে-মানুষটি হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করলেন বাইরে থেকে তারা

যেন ভিন্ন লোক। কিন্তু আসলে অভিন্ন— সেই রসিক গল্পপ্রিয় মফস্বলের বাসিন্দা বিষণ্ন মানুষটিই রাষ্ট্রপতি-ভবনে প্রবেশ করলেন। এমন এক পদমর্যাদায় আসীন হলেন, যেখানে পদাধিকারি যোগ্যতার যাচাই হয়ে যাবেই। রাষ্ট্রপতি হিসেবে লিংকনকে যে-সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তেমন সমস্যার মুখোমুখি আগের বা পরের কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানকে হতে হয়নি। জাতীয় সংকটের কষ্টিপাথরে লিঙ্কনের পরীক্ষা হয়েছিল, সেই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি।

শুরু হলো প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের কার্যকাল। তার প্রথম কাজ হলো মন্ত্রিপরিষদ গঠন। তিনি তাঁর মন্ত্রী হিসেবে যোগ্যতম মানুষদের বেছে নিলেন। রাষ্ট্রপতিপদে প্রাথী হওয়ার সময় যে-দুজন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সিওয়ার্ড এবং চেজ, তাদের তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। সিওয়ার্ড হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী। চেজ অর্থমন্ত্রী। চেজকে যখন তিনি মন্ত্রী করার কথা ভাবেন তখন লিঙ্কনের এক বন্ধু সতর্ক করে দিয়ে বলেন, চেজ কিন্তু নিজেকে লিঙ্কনের চেয়ে যোগ্যতর মনে করেন। লিংকন বন্ধুকে বলেছিলেন : যাঁরা-যাঁরা নিজেদের লিঙ্কনের চেয়ে যোগ্যতম মনে করেন তাঁদের নামের তালিকা তাঁকে দেওয়া হোক, তিনি সবাইকে মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন। আর মন্ত্রিপরিষদ গঠনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হলো গৃহযুদ্ধ। চার্লসটন পোতাশ্রয়ে অবস্থিত দক্ষিণের সৈন্যদের দ্বারাও ঘেরাও সুমটের দুর্গে লিংকন রসদ সরবরাহের দ্বায়িত্ব দিলেন নৌবাহিনীকে। অবরুদ্ধ দুর্গ ছেড়ে দেবার নির্দেশপালনে দুর্গের সেনাধ্যক্ষ রাজি না হলে দক্ষিণের সেনা দুর্গের উপর গোলা ছুড়তে শুরু করেন।

এই গোলাবর্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে গৃহযুদ্ধ শুরু হলো। দক্ষিণের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের জন্য ৭৫,০০০ সৈনিক পাঠাতে লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলিকে আদেশ দিলেন। এইবার উত্তর ক্যারোলিনা, ভার্জিনিয়া, টেনেসি ও আরাকানসাস রাজ্য চারটিও কনফেডারেট রাষ্ট্রে যোগ দিল। দাসপ্রথা চালু ছিল এমন অন্য কয়েকটি রাজ্য ডেলওয়ার, মেরিল্যান্ড, কেনটাকি, মিশুরি বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দিল না বটে, কিন্তু ওইসব রাজ্যের বহু নাগরিক ছিল কনফেডারেট রাষ্ট্রের সমর্থক। ভার্জিনিয়া বেরিয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র থেকে, অনেক উদ্বেগ ছিল মেরিল্যান্ড নিয়ে। মেরিল্যাভাও যদি বেরিয়ে যায় তা হলে দক্ষিণের আক্রমণ থেকে রাজধানী ওয়াশিংটনকে রক্ষা করা কঠিন হবে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে লিংকন পরিবার রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে চার বছর বসবাসের জন্য সব গুছিয়ে নিলেন। শ্রীযুক্তা লিংকনের বাসনা ছিল তিনি হবেন রাজধানীর সমাজের মক্ষিরাণী। সে-ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়নি। দক্ষিণের যেসব অভিজাত পরিবার রাজধানীতে বাস করত গৃহযুদ্ধ শুরু হতেই তারা নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে গেল। উত্তরের যেসব উচ্চবংশীয় মহিলা রাজধানীতে থেকে গেলেন তারা মফস্বল-আগত শ্রীযুক্তা লিংকনকে সমাজের নেত্রীরূপে মানতে তৈরি ছিলেন না। মেরির পরিবারের কেনটাকিবাসী কিছু আত্মীয় যে বিদ্রোহী

সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল, এ-কারণেও তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। সব মিলিয়ে তিনি একেবারেই জনপ্রিয় ছিলেন না, ফলে হোয়াইট হাউসের জীবন তাঁর পক্ষে সুখের হয়নি।

স্ত্রীর অ-সুখ নিয়ে ভাববার সময় ছিল না আব্রাহাম লিঙ্কনের; তিনি ভীষণ ব্যস্ত সরকারি প্রশাসনের কাজকর্ম নিয়ে, যুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে। এই সময় তাঁর মন হালকা করবার একমাত্র উপায় ছিল ছোটো দুই ছেলে উইলি আর ট্যাডের সঙ্গে গুরুগম্ভীর রাষ্ট্রপতি-ভবনে হুটোপাটি করে বেড়াবার মধ্যে। তাদের সঙ্গে হুল্লোড় করবার সময় তিনি ভুলে যেতেন সব রাজনৈতিক সমস্যা আর সংকট। ছোটোদের শাসন করা তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। তিনি বরং আদর দিয়ে নষ্ট করতে রাজি ছিলেন। উত্তরাঞ্চলের লোকেরাও, এমনকি তার সমর্থকেরাও অনেকে লিংকনকে ভাঁড় মনে করত, তার আচার-আচরণকে অমার্জিত মনে করত। তাঁর ভাষা ছিল শাদাসিধে, তাঁর আচরণ ছিল অকৃত্রিম। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একেবারে স্বাভাবিক মানুষ। তার স্বাভাবিক আচরণে পরিশীলিত অতিভদ্র নরনারী সংকুচিত লজ্জিত হলেও তিনি নিজে একেবারেই বিচলিত হতেন না। জন্মগত প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তিনি। ইস্পাতের মতো খাঁটি, ইস্পাতের মোত সাহসী। ভুলচুক তিনি করেননি তা নয়, কিন্তু ভুল তিনি করেছেন সত্যে পৌঁছতে গিয়ে। কবি ওয়ালট্ হুইটম্যান থেকে সবাই বুঝেছিলেন, লিংকন সৎ প্রাজ্ঞ সাহসী এবং দয়ালু। সমকালীন একজন উচ্চবংশীয় মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন। লিংকনের জীবনাচরণের স্বাভাবিক সরলতার মধ্যে প্রকাশ পায় তার গণতান্ত্রিক মানসিকতা। তিনি লিংকনকে গণতান্ত্রিকতার প্রতিমূর্তি বলে বর্ণনা করেছেন।

ক্রীতদাস-প্রথার প্রশ্ন তো ছিলই, কিন্তু এই গৃহযুদ্ধে আর-একটা প্রশ্ন ছিল রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতিরক্ষার। দেশের কোনো-একটা ছোটো অংশের মানুষের সমগ্র দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার আছে কি না, এইটো হলো প্রশ্ন। কিছু বিক্ষুব্ধ নাগরিকের কি অধিকার আছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ভাঙবার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেবার? লিঙ্কনের নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের মানুষ দেশের ঐক্য বজায় রাখতে এগিয়ে এল। দক্ষিণের নেতারা ভেবেছিল উত্তরের লোকেরা শেষ পর্যন্ত লড়বে না, তাদের সেই আশা ভুল প্রমাণিত হলো। উত্তরের লোকসংখ্যা দুই কোটি কুড়ি লক্ষ, দক্ষিণের বড়োজোর নব্বই লক্ষ, তার মধ্যে আবার চল্লিশ লক্ষ্যই ক্রীতদাস। ক্রীতদাসরা কি আর তাদের পরাধীনতা চিরস্থায়ী করবার জন্য দক্ষিণের হয়ে লড়তে পারে? সম্পদেও ছিল উত্তরের রাজ্যগুলি অনেক বলীয়ান। যতদিন গৃহযুদ্ধ চলল, ততদিন দক্ষিণের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি করে খারাপ হয়েছে, উত্তরের ক্রমেই ভালো হয়েছে। যুদ্ধের প্রথম বছরে বিদ্রোহীরা ইওরোপের বাজারে তুলো বিক্রি করেনি। পরে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী বন্দরগুলি ঘিরে ফেলায় তারা আর তুলো রপ্তানি করতে পারেনি। তুলো, তাদের প্রধান ফসল, বিক্রি করতে না পারায় কনফেডারেট রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়।

দক্ষিণ কিন্তু একটা দিক থেকে এগিয়ে ছিল, সামরিক নেতৃত্বের দিক থেকে। কনফেডারেট রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিস নিজে পেশাদার যোদ্ধা ছিলেন। তাদের পক্ষের প্রধান সেনাপতি রবার্ট লি ছিলেন খুব বিচক্ষণ আর সাহাসী সেনানায়ক। আর সেনাপতি বাছাইয়ের ব্যাপারে লিংকনকে খুব ভুগতে হয়েছিল। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন পঁচাত্তর বছরের বুড়ো, অক্ষম স্বাস্থহীন স্কট। বুল রানের যুদ্ধে সরকারি বাহিনী হেরে গেলে লিংকন বুঝতে পারলেন গৃহযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে। এবার ম্যাকক্লেলানকে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন। ছোটোখাটো দু-একটা যুদ্ধে জেতার ফলে তাঁকে বামনের দলে দৈত্য মনে করা হয়েছিল। লিংকন তাঁকে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করবার নির্দেশ দিলেন। আর এই জ্ঞাতিযুদ্ধ যে কত পরিবারে বিপর্যয় এনে দিচ্ছে একটি ঘটনায় তা লিংকনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে গিয়েছিল। এলসওয়ার্থ বলে এক তরুণ সৈনিককে তিনি খুব ভালোবাসতেন। স্প্রিংফিল্ড থেকে তিনি যখন প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের জন্য ওয়াশিংটন আসছিলেন তখন তার প্রহরীদলে ছিল এই

এলসওয়ার্থ। একটি যুদ্ধে জয়ের পর কনফেডারেট রাষ্ট্রের পতাকা নামাতে গিয়ে কর্নেল এলসওয়ার্থ মারা যান। এই মৃত্যুতে লিংকন স্বজন-হারানোর দুঃখ পেয়েছিলেন।

পশ্চিমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন ফ্রেমন্ট, ১৮৫৬ সালের নির্বাচনে যিনি রিপাবলিকান দলের হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। তার অযোগ্যতার পরিচয় পেতে দেরি হলো না। অযোগ্যতা ছাড়াও অন্য এক কারণে সুযোগসন্ধানী ফ্রেমন্টকে পদচ্যুত করতে লিংকন বাধ্য হয়েছিলেন। খবরের কাগজ পড়ে তিনি জানতে পারলেন তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না করে, ফ্রেমন্ট মিশুরি রাজ্যের ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে এক ঘোষণা জারি করেছেন। মিশুরি রাজ্যে দাসপ্রথা চালু থাকলেও ঐ রাজ্য বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়নি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল। সেখানকার ক্রীতদাসদের মুক্তি দিলে স্বভাবতই ঐ রাজ্যও বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেবে। গৃহযুদ্ধের সংকটময় অবস্থায় লিংকন সমস্যা বাড়াতে চাননি। তিনি ফ্রেমন্টের ঘোষণাপত্র বাতিল করে দিলেন। এ-কাজের জন্য তাকে নিন্দিত হতে হয়েছিল। কিন্তু লিংকন ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি জানতেন, বাস্তবকে উপেক্ষা করা চলে না, ন্যায়নীতি প্রতিষ্টার জন্যে ধরে ধীরে বাস্তব অবস্থাকে বদলে নিতে হয়। যারা উৎখাতপন্থী তাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের ঐক্য আর সংহতি রক্ষা করা।

ফ্রেমন্ট পদচ্যুত হলেন, সেনাপতি এখন ম্যাকক্লেল্যান। ফ্রেমন্ট ছিলেন লিংকনের নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির সদস্য আর ম্যাকক্লেলান ছিলেন বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য। কিন্তু দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে লিংকন দলাদলি ভুলতে জানতেন, বারে-বারে তার প্রমাণ পাব আমরা।

কিন্তু ম্যাকক্লেলান বিষয়েও তার অচিরে মোহভঙ্গ হলো। ম্যাকক্লেলান এক বিরাট সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতে লাগলেন দীর্ঘ দিন ধরে। সৈন্যবাহিনীর জন্য এটা চাই ওটা চাই বলে ক্রমাগত ফর্দ পাঠাচ্ছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষকে আক্রমণের কোনো উদ্যোগ দেখাচ্ছেন না। তার ব্যবহারও ছিল খুব উদ্ধত। একবার লিংকন তাঁকে ডেকে না পাঠিয়ে নিজে ম্যাকক্লেলানের বাসগৃহে মন্ত্রী সিওয়ার্ডকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেনাপতি বাড়ি নেই জেনে তঁরা অপেক্ষা করছিলেন। ম্যাকক্লেলান ফিরে এসে অপেক্ষারত রাষ্ট্রপতির দিকে না তাকিয়ে সোজা দোতলায় উঠে যান। পরে ভৃত্যকে দিয়ে সেনাপতিকে খবর পাঠালে ভৃত্য এসে খবর দিল জেনারেল ম্যাকক্লেলান ঘুমোতে গিয়েছেন। অন্য কেউ সহ্য করত না, কিন্তু অপরিসীম ধৈর্যশীল লিংকন এই অপমান হজম করেন এবং বলেন, জাতির এই সংকটকালে ভদ্রতাহানির ব্যাপারকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। ম্যাকক্লেলান যদি যুদ্ধে জয়ী হতেন তা হলে ম্যাকক্লেলানের ঘোড়ার রেকব ধরতেও আপত্তি ছিল না তাঁর। যুদ্ধে ম্যাকক্লেলানের কোনো উদ্যোগ নেই দেখে লিংকন সেনাপতিদের উদ্দেশে আদেশ জারি করলেন। ১৮৬২-র ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সৈন্য ও নৌবাহিনীকে বিদ্রোহীদের আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে হবে। ম্যাকক্লেলান তাকে বোঝালেন, একেবারে

তারিখ নির্দিষ্ট করে জানালে প্রতিপক্ষেরই সুবিধা হবে। তা ছাড়া এত বড়ো বাহিনীর গতিবিধির পক্ষে শীতের শেষে রাস্তাঘাট এখনও উপযুক্ত হয়নি। ম্যাকক্লেলান যখন স্থাণু হয়ে বসে আছেন। তখন পশ্চিমপ্রান্তে কিন্তু ইউলিসিস গ্রান্ট বলে তখনও পর্যন্ত অখ্যাতনামা এক সেনাপতি দক্ষিণের দুটো দুর্গ জয় করে নিলেন। নৌযুদ্ধেও দক্ষিণের আক্রমণকে লৌহবর্মাবৃত মানিটর নামের যুদ্ধজাহাজ প্রতিহত করে দিল।

যুদ্ধের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে না, রাজনৈতিক জীবনেও যখন লিংকন অনিশ্চয়তায় ভুগছেন, তখন তার ব্যক্তিগত জীবনেও নেমে এল এক বিরাট আঘাত। অসুখে ভুগে পুত্র উইলির মৃত্যু হলো। ভয়ংকর আঘাত পেয়েছিলেন লিংকন, কেননা খুব স্নেহশীল বাবা ছিলেন তিনি। মৃত সন্তানকে ছাড়তে পারছিলেন না, দু-দুবার কবর থেকে তুলে তার মুখে দিকে নিমেষহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি।

কিন্তু ব্যক্তিগত দুঃখ নিয়ে ভাববার বেশি সময় এই সংকটকালে ছিল না। মৃত সন্তানের স্মৃতি-বুকে জীর্ণ-শীর্ণ প্রেসিডেন্ট তাঁর জাতীয় দ্বায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। মার্চে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ম্যাকক্লেলান এগোলেন বটে, কিন্তু অতি-সাবধানী বিলম্বের জন্য জয় হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল। ইয়র্ক শহর ঘেরাও করে ম্যাকক্লেলান এক মাস বসে রইলেন, যদিও সেই শহর রক্ষা করছিল তার দশ ভাগের এক ভাগ সৈন্য। রিচমণ্ড শহরের কাছে সাত দিনের মুখোমুখি যুদ্ধে কার্যত উত্তরের বাহিনী পরাস্ত হলো।

এক বছরের প্রস্তুতির পর রিচমণ্ডের যুদ্ধে ম্যাকক্লেলেনের পরাজয়ে লিংকন মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু কাজের তো বিরাম নেই। পরাজিত সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে তিনি গেলেন, রাজ্যের গভর্নরদের তিনি নির্দেশ দিলেন আরও তিন লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের। এই মধ্যপন্থী প্রেসিডেন্ট সীমান্তবতী রাজগুলির প্রতিনিধিদের ডেকে বারবার অনুরোধ করলেন ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে দাসপ্রথার অবসানের জন্য। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি মনস্থির করে ফেললেন। জনৈক মন্ত্রীর মৃত শিশুপুত্রকে কবর দেবার সময় (নিজের পাঁচ মাস আগে মৃত সন্তানের কথা নিশ্চয় মনে পড়ছিল) লিংকন বললেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার পক্ষে এটা অনিবার্য যে, হয় আমরা ক্রীতদাসদের মুক্ত করব, অথবা, আমরা নিজেরাও দাসে পরিণত হব।

লিংকন দাসপ্রথা উচ্ছেদ করতে চাইছিলেন। কিন্তু সীমান্তবতীর্ণ যে রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথা বজায় ছিল অথচ যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল, তাদের তিনি বাস্তব কারণে বিরূপ করতে চাইছিলেন না। সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না ধরনের, কিন্তু নিজের দায়িত্বে একটি ঘোষণাপত্র জারি করতে চাইলেন যে ১৮৬৩ সালের পয়লা জানুয়ারির পর থেকে যেসব রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বাস্তবিকপক্ষে মান্য করবে না, সেইসব রাজ্যের সব ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ এই আদেশের দ্বারা বিদ্রোহী রাজ্যগুলির ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হলো, কিন্তু মিশুরি কেনটাকি মেরিল্যান্ড ডেলওয়ারের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্য,

ক্রীতদাস-প্রথা থাকা সত্ত্বেও যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে গিয়েছিল, সেইসব রাজ্যের ক্রীতদাসেরা এই ঘোষণায় মুক্ত হলো না। মন্ত্রীরা আপাতত এই ঘোষণাপত্র জারি না করবার পরামর্শ দিলেন। তাঁরা বললেন, একটি যুদ্ধজয়ের ঘটনার পর ঘোষণাটি করলে তার প্রতিক্রিয়া বেশি ভালো হবে। লিংকন এই পরামর্শ মেনে নিলেন। অল্প দিন পরেই আনটিটামের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর জয় হলে ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করা হয়। এই সময় 'এক কোটি মানুষের প্রার্থনা' নামে একটি খোলা চিঠিতে লিংকনের প্রতি আবেদন করা হয় তিনি যেন ক্রীতদাস-প্রথার অবসান ঘটান। উত্তরে লিংকন জানান, বর্তমানে তার প্রধান লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করা। যদি তিনি দাসপ্রথা অক্ষুন্ন রেখে যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করতে পারেন তা-ই করবেন, যদি দাসপ্রথা উচ্ছেদ করলে যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বজায় থাকে, তবে তাই করবেন। এই তাঁর তৎকালীন সরকারি মত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি জানালেন সর্বত্র মানুষ মুক্ত জীবন যাপন করুক এই তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা।

সে যা-ই হোক, দাসপ্রথার মুক্তির ঘোষণাপত্রের দুটো বড়ো লাভ হলো : ইউরোপের জনমত লিংকনের পক্ষে এল. আর মার্কিন সৈন্যবাহিনীতে কালো চমড়ার মানুষেরা নিযুক্ত হতে পারল। যুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ নিগ্রোসেনা মার্কিন বাহিনীতে যোগ দিতে পেরেছিল। লিংকন বলেছিলেন ইতিহাসের গতি থেকে কারও রেহাই নেই। যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা রক্ষা করেছি, আর ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে আমরা সব দেশের সব স্বাধীন মানুষের স্বাধীনতার জামিনদার হচ্ছি।

এই মুক্তির ঘোষণাপত্র ইওরোপের শ্রমজীবী মানুষের মনে কীরকম সাড়া জাগিয়েছিল তার একটা প্রমাণ দিই। দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে তুলো রপ্তানি না হওয়ায় তুলোর অভাবে ইংল্যান্ডে ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়কল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে কাপড়কালের শ্রমিকেরা অনাহারের মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের দুরবস্থা ভুলে গিয়ে লিংকনকে চিঠি লিখে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়। লিংকন অভিভূত হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানান। আবার মার্কিনদেশের উত্তরের রাজ্যগুলির মানুষ ইংল্যান্ডের ক্লিষ্ট শ্রমজীবীদের জন্য চাঁদা তোলে, জাহাজে করে তাদের জন্যে গম পাঠায়। এই ঘটনায়, পৃথিবীর সব দেশের শ্রমজীবী মানুষ যে ভাই-ভাই, সেই বোধের প্রমাণ পাই।

এদিকে যুদ্ধ তো চলছেই। ফ্রেডেরিক্সবার্গে পরাজয়ের পর নতুন সেনাপতি হলেন হুঙ্কার। তাতেও অবস্থার উন্নতি হলো না। কিন্তু পরবর্তী সেনানায়ক মিডের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী তিন দিনব্যাপী যুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে হারিয়ে দিল লি-র বিদ্রোহী বাহিনীকে। একই সময়ে কয়েক মাস ধরে অবরুদ্ধ ভিকসবার্গ শহর জেনারেল গ্রান্টের নেতৃত্বাধীন সরকারি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। মোটামুটি বলা যায়, এখন যুদ্ধের গতি চলে এল যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর অনুকূলে। দুটো স্বতন্ত্র দেশের মধ্যে যুদ্ধ করতে হলে হয়তো এর পরেই যুদ্ধ থেমে যেত। কিন্তু

এই যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে লড়াই; তাই দুই জেদি প্রতিপক্ষ কেউ রারতে রাজি নয়। বিদ্রোহী কনফেডারেট বাহিনীর অস্ত্র, অর্থ ও রসদের অভাব, এমনকি নতুন সৈনিকদেরও অভাব দেখা দিল। কিন্তু তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। উত্তরাঞ্চলেও এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ নিয়ে মানুষের মনে অসন্তোষ ছিল। টাকার লোভেও মানুষ সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হতে এগিয়ে আসছিল না। কিন্তু গেটিসবার্গ ও ভিক্সবার্গের যুদ্ধে জয়ের ফলে উত্তরাঞ্চলের খানিকটা আস্থা ফিরে এল ; আর শত্রুদের শত মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও এই সময় সাধারণ মানুষ কীভাবে যেন জেনে গেল আব্রাহাম লিংকনের মতো সৎ খাঁটি মানুষ আর হয় না। তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলে, তার হাঁটাচলায় সকলে বুঝে গিয়েছিল লিংকন হার মানবার পাত্র নন। তিনি হয়ে উঠলেন সাধারণ মানুষের চোখের মণি। ছুটিকে বাড়ি ফেরা সৈনিকদের মুখে মুখে, সৈনিকদের পত্নী আর বিধবাদের মুখে-মুখে তার সরল সততার বার্তা রটে গেল। তিনি ক্রমেই হয়ে উঠলেন কিংবদন্তির মানুষ।

গেটিসবার্গ যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের জন্য জাতীয় সমাধিস্থল উৎসর্গ করবার দিনে মূল বক্তা ছিলেন জনৈক এডোয়ার্ড এভেরেট। লিংকনকে কয়েকটি কথা বলবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। সেই ছোট্ট বক্তৃতাটি গেটিসবার্গ বক্তৃতা নামে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বললেন, আমাদের শপথ নিতে হবে যাতে নিহতদের মুত্যু বৃথা না যায়; যেন ‘Government of the people, by the people, for the people.’ দুনিয়া থেকে মুছে যেতে না পারে।

১৮৬৩ সালের শেষে লিংকন এক ঘোষণাপত্রে জানিয়ে দিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলে যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের ক্ষমা করা হবে। ব্যতিক্রম শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সেইসব উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা নিজের দায়িত্ব ছেড়ে বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধজয়ের পর পরাস্ত রাজ্যগুলির সরকার কেমন হবে তার পরিকল্পনাও তিনি পেশ করলেন। আর ১৮৬৪-র শেষে দক্ষতা আর উদ্যোগে খুশি হয়ে তিনি জেনারেল গ্রান্টিকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু পঞ্চান্ন হাজার যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যের মৃত্যুর বিনিময়েও যখন অবরুদ্ধ বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাস্ত করে গ্রান্ট রিচমন্ড শহর দখল করতে পারলেন না তখন হতাশা দেখা দিল আবার। সেই অবস্থার মধ্যেই শুরু হলো ১৮৬৪-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি।

চার বছর অন্তর-অন্তর নির্বাচনের কথা, যুদ্ধের সংকটের মধ্যেও তার কোনো ব্যতিক্রম হলো না। রিপাবলিকান পার্টির একদল চাইল লিঙ্কনের মন্ত্রিসভার সদস্য চেজকে প্রার্থী করতে, অন্য দল চাইল ১৮৫৬ সালের পরাজিত প্রার্থী ফ্রেমন্টকে আবার রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে দাঁড় করাতে। সেনাপতি গ্রান্টের কথাও রাষ্ট্রপতিদের প্রার্থী হিসেবে ভাবা হয়েছিল। শুনে লিংকন বলেছিলেন, গ্রান্ট পারেন, তা হলে তিনি প্রেসিডেন্ট হলে লিংকন অখুশি হবেন না। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন নির্বাচনী রাজনীতিতে সেনাপতি জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনায় লিংকন খানিকটা ভাবনায় পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মধ্যপন্থীদের সমর্থনে লিংকনই

দ্বিতীয়বার দলের প্রার্থী মনোনীত হলেন। স্থির হলো, এই নির্বাচনে জয়ী হলে লিংকন বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোনো সমঝোতায় যাবেন না, ক্রীতদাস প্রথা একেবারে উচ্ছেদের জন্য দেশের গঠনতন্ত্র সংশোধন করবেন। অন্যদিকে পদচ্যুত সেনাপতি ম্যাকক্লেলানকে ডেমোক্রেটিক পার্টি তাদের প্রার্থী মনোনীত করল রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের জন্য। দল তাকে বলল, নির্বাচনে জিতলে যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে শান্তি ফেরাতে। ম্যাকক্লেলান দলের প্রার্থী হতে রাজি হলেন, কিন্তু দলের ঐ সুপারিশ মানতে রাজি হলেন না। এদিকে রিচমন্ড যুদ্ধে গ্রান্ট হেরে যাওয়ায়, অনেক মাস ধরে ঘিরে ধরা সত্ত্বেও পিটসবার্গ শহর দখল করতে না পারায় উত্তরের রাজ্যগুলিতে অসন্তোষ বাড়ছিল। আর তাতে নির্বাচনে লিংকনের জয়ের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হচ্ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গেও প্রেসিডেন্টের বিরোধ বাড়ছিল। অবস্থা বিবেচনায় অনুরোধ করছিলেন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে। লিংকনও স্থির করে ফেলেছিলেন যতদিন নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কার্যভার গ্রহণ না করেন। ততদিন তিনি তাঁর কাছে যুদ্ধজয়ের ব্যাপারে পরামর্শ ও সহযোগিতা নেবেন। এদিকে তার খরচে-স্বভাবের স্ত্রীর পোশাক আর গয়না কিনে সাতশো হাজার ডলার বাজারে ধার করে বসে আছেন! দোকানদারেরা তাগাদা দিতে শুরু করেছে। শ্রীযুক্তা লিংকন বুঝলেন, তাঁর স্বামী জয়ী হবেন না ধরে নিয়েই দোকানির চাপ দিচ্ছে, স্বামী জিতলে তবেই তিনি ওই পরিস্থিতি থেকে আপাতত রেহাই পাবেন। সুতরাং তিনিও নিজের গরজে তৎপর হলেন স্বামীকে নির্বাচনে জেতাতে! যুদ্ধের শেষ পর্বে একদিন গুপ্তঘাতকের আক্রমণ থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন লিংকন। যখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে ওয়াশিংটন শহরের বাইরে তাঁর গ্রীষ্মবাসে যাচ্ছিলেন তখন অন্ধকারে আততায়ীর গুলি তাঁর দিকে ছুটে আসে। ভাগ্য ভালো যে তিনি আহতও হননি, কিন্তু গুলির আঘাতে তার মাথার টুপি মাটিতে পড়ে যায়। ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শলাপরামর্শ, প্রস্তুতি। ঠিক নির্বাচনের মুখোমুখি যুদ্ধের মোড় নিশ্চিতভাবে ঘুরল। যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক শেরম্যান আটলান্টা দখল করে ধ্বংস করলেন। শেরিড্যান বলে আর একজন সেনাপতি আর্লির অধীনস্থ বিদ্রোহীবাহিনীকে ছত্রখান করলেন। এইসব জয়ে লিঙ্কনের নির্বাচনী জয়ও সহজ হলো। লিংকন পেলেন বাইশ লক্ষ ভোট, ম্যাকক্লেলান আঠারো লক্ষ। লিংকন দ্বিতীয়বারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনের উপর নির্ভর করছিল সমগ্র জাতির অস্তিত্ব : লিংকন জয়ী হলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা পেল। লিংকন নির্বাচনে জয়ের পর বলেছিলেন, নির্বাচন বিনা গণতন্ত্র হয় না; যুদ্ধের জরুরি অবস্থার অজুহাতে যদি পিছিয়ে দেওয়া হতো তা হলে গণতন্ত্রেরই পরাজয় হতো।

সেনাপতি শেরম্যান আটলান্টা ধূলিসাৎ করবার পর জর্জিয়ার দিকে অভিযান করলেন, দখল করে নিলেন কোলাম্বিয়া চার্লসটন। গ্রান্ট রিচমন্ড ও পিটাসবার্গের উপর অবরোধ কঠোর করলেন। জয় যখন সুনিশ্চিত তখন লিংকন কংগ্রেসের

উদ্দেশে এক বাণীতে জানালেন, প্রমাণিত হয়েছে যে বেশির ভাগ মানুষ ক্রীতদাস-প্রথার অবসান চায়। তিনি সুদৃঢ়ভাবে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদের পক্ষে; মুক্ত ক্রীতদাসদের আবার ক্রীতদাসে পরিণত করবার সব চেষ্টাকে তিনি প্রতিহত করবেন। লিঙ্কনের সুপারিশে ১৮৬৫ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে মার্কিন কংগ্রেসের দাসপ্রথার অবসানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র সংশোধন করল। এই কাজ হলো লিংকনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুকৃতি।

লিংকনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার : তিনি যে দলীয়তা, ব্যক্তিগত বিরোধের উর্ধ্বে উঠতে পারতেন আগে তার প্রমাণ দিয়েছি। আরও দু-একটা প্রমাণ দিই। এডুইন স্ট্যান্সটন লিংকনকে অবজ্ঞা করতেন, তাঁর অনেক কাজকে মূর্খের কাজ মনে করতেন। বন্ধুরা নিশ্চয়ই এসব কথা লিংকনকে জানাতে ভোলেননি, অথচ লিংকন এই স্ট্যান্সটনকেই যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। যে চেজ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে তার কাজে সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছেন, যে-চেজ ছিলেন রিপাবলিকান দলের হয়ে প্রেসিডেন্টপদের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, তাকেই লিংকন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করলেন। আইনজ্ঞ হিসেবে চেজের যোগ্যতা বিষয়ে লিংকনের উঁচুধারণা ছিল, তাই ব্যক্তিগত বিরোধকে তিনি আমলাই দিলেন না।

শুরু হলো যুদ্ধাবসান ও শান্তির জন্য আলোচনা। কনফেডারেট রাষ্ট্রপতি জেফারসন ডেভিস চাইছিলেন শান্তি এবং যুক্তরোষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা। লিংকন চাইলেন শান্তি এবং পুনর্মিলন। ফলে শান্তি আলোচনা ভেঙে গেল। কিন্তু দক্ষিণের শান্তিদূতদের মধ্যে একজন ছিলেন কনফেডারেট উপরাষ্ট্রপতি আলেকজাণ্ডার স্টিফেন। এই স্টিফেনের সঙ্গে লিঙ্কনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। তাঁর সরকারের কর্তৃত্বকে যারা অস্বীকার করেছে সেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা উচিত হচ্ছে কি না সে-বিষয়ে লিংকন সন্দেহ প্রকাশ করায় দক্ষিণের একজন দূত ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের দৃষ্টান্ত দেন। লিংকন উত্তরে বলেন, তিনি ইতিহাস ভালোমতো পড়েননি বটে, কিন্তু যতদূর তাঁর স্মরণে আছে তাতে মনে হয় প্রথম চার্লসের শিরশেছদ হয়েছিল। স্টিফেন তখন জানতে চান, বিদ্রোহের জন্য লিংকন তাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো উচিত বলে মনে করেন কি না। লিংকন সম্মতিতে মাথা নাড়লে স্টিফেন বলেন, ‘‘আপনি যখন প্রেসিডেন্ট তখন আমাদের ফাঁসির ভয় নেই। দয়ালু লিংকনের ক্ষমাশীল হৃদয়ের কথা তার বিরোধীরাও জানতেন। যুদ্ধকালে সেনাবাহিনী ছেড়ে পালানোর জন্য, কাজে গাফিলতির জন্য সেনা আদালতে অনেক সৈনিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। অপরাধীর বাবা-মা আবেদন করলেই লিংকন তাদের ক্ষমা করে দিতেন। তিনি বলতেন, কলমের একটা আঁচড়ে যখন একজন মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তখন তাকে মৃত্যুর পথে পাঠানো ভারি কঠিন! উইলিয়াম স্কট বলে এক তরুণ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে এসে এই খবর জেনে লিংকন তার সঙ্গে কথা বলেন। জানতে চান, কীভাবে সে জীবনদানের ঋণ প্রেসিডেন্টকে শুধবো। স্কট বলেছিল জমি বেচে, টাকা ধার করে সে ঋণশোধের চেষ্টা করবে। লিংকন উত্তরে বলেছিলেন, কাজে গাফলতি না করেই তাকে ঋণ শোধ করতে হবে, যাতে সে মৃত্যুকালে নিজেকে বলতে পারে প্রেসিডেন্টকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে-অক্ষরে সে পালন করেছে।

যুদ্ধ যে-তিক্ততা সৃষ্টি করেছে তা দূর করবার জন্য লিংকন প্রস্তাব দিলেন যদি বিদ্রোহীরা ১৮৬৫ সালের পয়লা এপ্রিলের মধ্যে অস্ত্রত্যাগ করে তা হলে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেবার ফলে যে-সম্পত্তির ক্ষতি হবে, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে চল্লিশ কোটি ডলার দেওয়া হবে। লিংকন মনে করতেন, এতদিন দক্ষিণে যে-দাসপ্রথা চালু ছিল তার জন্য উত্তরের রাজ্যগুলি তাদের

দায়িত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারে না। সেই দায়িত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই টাকা দিতে রাজি থাকা উচিত। মন্ত্রিসভা একমত হয়ে লিঙ্কনের এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। যে-যুদ্ধে জয় হয়েই গেছে সেই যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য পরাজিত পক্ষকে এই পুরস্কার দেবার প্রস্তাব কেউ মানতে পারেনি। লিংকনের মনে বিদ্রোহীদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তিনি তাদের সসম্মানে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। তা ছাড়া দীর্ঘ দিন ওকালতির অভ্যাসে লিংকনের মনে হয়েছিল, ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কারও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া বেআইনি। তিনি বুঝতে পারেননি, দাস-মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিলে তাদেরই হাত শক্ত করা হবে, যারা এই লোকক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের জন্য মূলত দায়ী।

১৮৬৫ সালের চৌঠা মার্চ রাষ্ট্রপতিপদে দ্বিতীয়বার লিংকন শপথ নিলেন। এবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথমবার একদল নিগ্রো সৈন্য রাষ্ট্রপতিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এল। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যুদ্ধক্লান্ত জাতির সামনে যে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন তার মূল কথা শান্তি। তিনি বললেন, দাসপ্রথার অপরাধের জন্যই ঈশ্বরেচ্ছায় মার্কিনদেশে এই গৃহযুদ্ধ ঘটেছে। দক্ষিণ ও উত্তর দুই অঞ্চলের মার্কিন নাগরিকই এই অপরাধে অপরাধী। চার বছরের ঘৃণা ও শত্রুতা তিনি ভুলে যাবার আবেদন করলেন। জানালেন, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি ক্ষমা হোক নতুন আরম্ভের মূলমন্ত্র। জাতীয় সম্পর্কে নেমে আসুক স্থায়ী শান্তি। যুদ্ধক্লান্ত, অথচ ইস্পাতের মতো শাণিত, পরিণতমনা মানুষটি যখন এই শান্তির ও মৈত্রীর কথাগুলি উচ্চারণ করছিলেন তখন ভিড় ঠেলে একটা লোক প্রেসিডেন্টের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে। তাকে প্রহরীরা সরিয়ে দেয়, তার চলাচল সন্দেহজনক মনে হলেও রক্ষীরা তাকে গেফতার করেনি। সন্দেহজনক ব্যক্তিটিকে সেদিন গ্রেফতার করলে ইতিহাস অন্যরকম হতো। অভিনয়-জগতে সুপরিচিত একটি পরিবারের সদস্য ছিল লোকটি। তার নাম, জন উইলকিস বুথ।

যেসব ষড়যন্ত্রকারী লিংকনকে হত্যার সুযোগ খুঁজে চলেছিল, পাগল বাবার খ্যাপাটে ছেলে বুথ ছিল তাদের একজন। লিংকন ছিলেন শেক্সপিয়রের নাটকের অনুরাগী আর বুথের ভাই ছিলেন শেক্সপিয়রের নাটকের এক বিখ্যাত অভিনেতা। জন উইলকিস বুথ মনে করত লিংকনই দায়ী গৃহযুদ্ধের জন্য, লিংকনের জন্যেই দক্ষিণের চূড়ান্ত বিপর্যয়। চৌঠা মার্চের চক্রান্ত ব্যর্থ হলো, আর একটা অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো সতেরোই মার্চ। ঐদিন লিংকনকে জীবিত অবস্থায় অপহরণের চেষ্টা করা হয়। ইতিমধ্যে জেনারেল গ্রান্ট পিটসবার্গের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবার নির্দেশ দিলে রাষ্ট্রপতি লিংকন সস্ত্রীক সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে যান। সেইখানে সেনাপতিদের সামনে তার স্ত্রী অশোভন আচরণ করলেও লিংকন ধৈর্য হারাননি। তিনি বুঝতে পারছিলেন, নিজে আচরণের উপর মেরির আর নিয়ন্ত্রণ নেই, তিনি অসুস্থ। নিজের উপর মেরির যে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে দামি পোশাক ও শৌখিন জিনিস ক্রমাগত কেনবার দরুন লিঙ্কনের

মৃত্যুকালে বাজারে তার ধার দাঁড়িয়েছিল সত্তর হাজার ডলার। স্বামীর অপঘাতে মৃত্যুর পর এই ধারের জন্যে মহিলাকে বিস্তর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছিল। আর, একদিকে যুদ্ধের জন্য, অন্যদিকে পারিবারিক অশান্তিতে লিংকন দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু শরীরে বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন না, হারিয়ে ফেলছিলেন। সহজ হাসির ক্ষমতা, উদ্ভট কিছু দেখলে সহজাত অনুভবের ক্ষমতা।

দুই সেনাপতি গ্রান্ট আর শেরম্যানের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে কথাবার্তা বললেন। অনেকেরই দাবি ছিল বিদ্রোহীদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হোক। কিন্তু লিংকন চাইছিলেন শান্তি আর যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য, তিনি চাইছিলেন যুদ্ধের ক্ষত সারিয়ে পুনর্মিলন। তাই তিনি বিরোধীদের উপর চাপানো না হয়। আটই এপ্রিল কামান-গর্জন একেবারে থেমে গেল। বিদ্রোহীদের সেনাপতি জেনারেল লি সব অস্ত্র নিয়ে জেনারেল গ্রান্টের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। লি-র সৈন্যদের নিজস্ব ঘোড়া আর নিজস্ব তরবারি রাখবার অনুমতি দেওয়া হলো। যে-রিচমন্ড শহরের দখল পরিদর্শনে গেলেন লিংকন নদীপথে। তিনি তীরে পা দিয়ে যখন ছোটো ছেলে ট্যাডের হাত ধরে হাঁটছিলেন তখন দুচারজন কালো মানুষ চিনতে পারল। আর অল্প সময়ের মধ্যেই কালো চামড়ার মানুষের এক জনতা জমে গেল তার চারধারে। তারা দেখতে এল সেই কিংবদন্তির মানুষটিকে, যিনি তাদের চোখে হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিদাতা সন্ত।

এই ঘটনার কিছু আগের কথা। খ্রিষ্টীয় যাজক ফ্রেডরিক ডগলাস নিগ্রো ক্রীতদাস হয়ে জন্মেছিলেন। তিনি লিঙ্কনের সঙ্গে দেখা করেন। দক্ষিণের সেনারা নিগ্রো বন্দিদের হত্যা করছে, কিন্তু লিংকন কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করছেন না, এই অভিযোগ নিয়ে তিনি কথা বলতে গিয়েছিলেন। আলোচনার শেষে তিনি আনন্দে যেন মাতাল হয়ে এসে বললেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে সমান মানুষের মতো ব্যবহার করেছেন। একবারও মনে হয়নি যে দুজনের গায়ের চামড়ার রং আলাদা। সেই সময় একথা ভাবাও যেত না। কালো চামড়ার এইসব নাগরিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নদীতীর দিয়ে হেঁটে কনফেডারেট প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিস যে-প্রাসাদে বাস করতেন সেই প্রাসাদে লিংকন প্রবেশ করলেন। বসলেন, ডেভিসের আসনে। এতদিনে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে এতদিনে, লিংকন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হলেন।

পোটোম্যাক নদীর পথে ওয়াশিংটন শহরের দিকে যাত্রা করল একটি জাহাজ। যাত্রাকালে সহযাত্রীদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে, কবিতা নিয়ে অনেক কথা বললেন লিংকন। পড়ে শোনালেন শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অংশ। যখন নিচে এই লাগুলিতে এলেন—

Duncan is in his grave,
After life's fitful fever he sleeps well:
Treason has done its worst : nor Steel, nor poison.
Malicon domestic, foreign levy, nothing
Can touch him further.

—তখন যেন নিজের জীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা বুঝে থেমে গেলেন তিনি। তারপর ধীরে-ধীরে দ্বিতীয়বার লাইনগুলি পড়লেন লিংকন। সহযাত্রীরা সেই আবৃত্তির স্মৃতি কোনোদিন ভুলতে পারেনি। একই সময়ে তিনি একটি দুঃস্বপ্নও দেখেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে নিকট-ভবিষ্যতে তার ভাগ্যে যা ঘটবে তার নির্ভুল ছায়া পড়েছে। বরবার আততায়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন বলেই স্বভাতব সব সময় গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত হওয়ার সম্ভাবনার কথা মনে থাকত। তার আর এমন স্বপ্ন তাঁর ঘুমকে বিচলিত করত। গভীর রাত্রে ঘুমের মধ্যে তিনি শুনলেন। কারা যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। স্বপ্নের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি-ভবনের কক্ষে-কক্ষে ঘুরে তিনি কান্নার উৎস খুঁজছিলেন। অবশেষে এলেন হোয়াইট হাউসের পূর্বকক্ষে। স্বপ্নের মধ্যেই দেখলেন সৎকারের পোশাকে একটি শবদেহ শোয়ানো, প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে, মৃত মানুষটিকে ঘিরে কান্নায় ভেঙে পড়েছে শোকার্তেরা। ঘুমের মধ্যেই তিনি প্রশ্ন করলেন, মৃত মানুষটি কে? উত্তরে শুনলেন, গুপ্তঘাতকের হাতে প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন।

যুদ্ধশেষের খবরে, লি-র আত্মসমর্পণের খবরে, রাজধানীতে দেখা দিয়েছিল বিপুল উল্লাস। আর লিংকন যেন তাঁর দুঃস্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে ওয়াশিংটনে প্রবেশ করলেন। ১০ এপ্রিল রাত্রে মশাল-শোভাযাত্রায় নাগরিকেরা তাঁকে অভিনন্দিত করল। সবাই তাঁকে বক্তৃতা দিতে বললে তিনি একবারও যুদ্ধজয়ের কথা বললেন না, বললেন শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কথা। মার্কিনদেশের কালো চামড়ার বাসিন্দাদের সীমিত ভোটাধিকার দেবার প্রস্তাব

তিনি দিলেন। ১৪ এপ্রিল ছিল সুমটের দুর্গের পতনের বাৎসরিক। ঐ দুর্গের পতন দিয়েই হয়েছিল গৃহযুদ্ধের আরম্ভ। রবার্ট অ্যানডারসন নামে যুক্তরাষ্ট্রের এক সৈনিক ১৮৬১ সালে ঐ তারিখে দুর্গের মাথা থেকে জাতীয় পতাকা নামাতে বাধ্য হয়েছিল, সে-ই চার বছর পরে আবার সুমন্টের দুর্গের মাথায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিল।

মন্ত্রিপরিষদের সভার পর ঐদিন সন্ধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেলেন লিংকন। সস্ত্রীক জেনারেল গ্রান্টের সঙ্গী হবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের বদলে সঙ্গী হলো এক তরুণ সেনানী ও তার ভাবী বউ। খুব জনপ্রিয় নাটকটির নাম ‘আওয়ার আমেরিকান কাজিন’; ভূমিকার অভিনেত্রী ছিলেন সুপরিচিতা লরা কিন। জনপ্রিয় হাসির নাটক দেখতে দেখতে লিংকন যেন অদম্য হাসির বেগে ভুলতে চাইছিলেন যাবতীয় রাজনৈতিক সমস্যা। দ্বিতীয় অঙ্ক চলাকালীন রাষ্ট্রপতির বকসের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল এবং একটিমাত্র গুলির আঘাতে চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। জন উইলকিস বুধ এবারে আর নিশানায় ভুল করেনি।

গুলির আঘাতে চেতনা হারালেন লিংকন, মার্কিনদেশের জাতীয় সংহতির রক্ষাকর্তা এবং কালো মানুষের মুক্তিদাতা লিংকন। পরদিন ১৮৬৫ সালের পনেরোই এপ্রিল বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যখন সকাল হলো, তখন এই প্রসন্ন স্থিতধী বীরের শেষনিশ্বাস শূন্যে মিলিয়ে গেল। ওয়াশিংটন নগরের পথ দিয়ে তাকে প্রথমে আনা হলো রাষ্ট্রপতি ভবনে, হোয়াইট হাউসে। জীবনের জ্বর-যন্ত্রণার পর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। বিশ্বাসঘাতকতা তার চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে; এর পরে ইস্পাতের ছুরি বা বিষ, অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ বা বিদেশী আক্রমণ কোনকিছুই তাঁকে আর ছুঁতে পারবে না।

হোয়াইট হাউস থেকে হাজার হাজার শোকার্তা মানুষকে পিছনে রেখে শরবাহী ট্রেন চলল বালটিমোর, ফিলাডেলফিয়াম নিউ ইয়র্ক, ক্লিভল্যান্ড শিকাগো, ব্লুমিংটন, আটলান্টা পার হয়ে অবশেষে স্প্রিংফিডে; সেই শহরে, যে-শহর সিকি শতাব্দী ধরে ছিল তার কাজের কেন্দ্র। হাজার মানুষ শেষ চোখের দেখা দেখতে এল তৃণভূমিতে লুকানো বিচ্ছিন্ন সব গ্রাম থেকে, কৃষিখামার থেকে, আশেপাশের ছোটো শহর থেকে; সেইসব পরিচিত মানুষ যারা তাঁকে ওকালিতি করতে দেখেছে, এমনকি ঘোড়ার গাড়ি করে সপরিবারে যখন তিনি এই শহরে প্রথম এসেছিলেন, তা-ও দেখেছে। জীবন দিয়ে শপথের মর্যাদা রক্ষা করে, যেন তিনি ফিরে এলেন নিজের ঘরে। এখানেই সমাহিত হলেন অসাধারণ সাধারণ মানুষ আব্রাহাম লিংকন । গৃহযুদ্ধের ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে রাষ্ট্রের জাহাজ নিরাপদে বন্দরে পৌঁছেছে। রাষ্ট্রে জাহাজের ক্যাপটেন লিংকন আজ মৃত; কিন্তু জাহাজ বিপন্মুক্ত।

ওঠে ওঠো, ঘণ্টা বাজছে শোনো,
তোমার জন্যে নিশান উড়ছে, ভেঁপু বাজছে,
ফুলের মালা আর রেশমে-মোড়া পুস্পগুচ্ছ,
তীরে তীরে জনতার ভিড়—
তাদের উদ্‌গ্রীব মুর্খ উর্ধ্বে তোলা,
হে অধিনায়ক হে প্রিয় জনক।…
আমি কিন্তু বিষাদ-পীড়িত মনে পাটাতনে পায়চারি করছি
যেখানে আমার অধিনায়ক পড়ে আছে
মৃত অথবা হীম-শীতল।